সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

প্রকাশক
ফোরকান আহমদ, বিএ অনার্স; এম এ
স্বত্বাধিকারী, পালক পাবলিশার্স
৮/২ নর্থ সাউথ রোড, পুরানা পল্টন
যোগাযোগ : ১৭৯/৩, ফকিরেরপুল
জিপিও বক্স নং ৪১৫, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৪৫৮১৬, মোবাইল : ০১৭২০৩০৮৮৬১

প্রকাশকাল
ভাদ্র ১৪১৫
আগস্ট ২০০৮

গ্রন্থস্বত্ব
সাফিনা আহমেদ
ইশতিয়াক আহমেদ

প্রচ্ছদ
মোকতাদুল হক

মুদ্রণ
মাটি আর মানুষ
১৭৯/৩, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ দুইশত টাকা

Samprodaikota Theke Mukti by Mahbub ul Alam Chowdhruy. Published by Forkan Ahmad. Proprietor, Palok Publishers, 8/2, North South Road, Purana Palton, Contact : 179/3, Fakierpool, GPO Box No. 415, Dhaka-1000, Bangladesh. Cover Designed by Moktadul Hoque, First Published July 2008, Price Tk 200.00 US $ 10

ISBN 984 445 233 03

কবির ইচ্ছা অনুযায়ী বইটি
তাঁর স্নেহাস্পদ কথাশিল্পী
হাসনাত আবদুল হাইকে
উৎসর্গ করা হলো

কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর এই লেখাগুলো পুস্তক আকারে প্রকাশ করার জন্য তার বন্ধুরা আমাকে কয়েকবার অনুরোধ করেছেন। তিনি নিজেও এই লেখাগুলো পরিশীলিত করে বই হিসেবে প্রকাশ করার ইচ্ছা কয়েকবার কথা প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। তার সে ইচ্ছা পূরণ করার সময় পাননি। দায়িত্বটা আমাকেই পালন করতে হয়েছে। নিজের হাতে আমাকে দীৰা দিয়েছেন, শিখিয়েছেন-কীভাবে এ কাজ সমাধা করা যায়। তার মতো এমন অসাধারণ ব্যক্তির সান্নিধ্যে থেকে যা শিখেছি তা আমার জন্য পরম পাওয়া।

তার পছন্দ মতো বইটি প্রকাশ করার জন্য আমার স্নেহাস্পদ প্রকাশক ফোরকান আহমদ বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। আবদুর রহিম, কবির সহকারী রাতদিন অজস্র পরিশ্রম করে আমাকে সহায়তা করেছে। মোকতাদুল হক অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন। তাদের সকলের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

এই বই ছাপাবার জন্য যারা আমাকে সর্বদা উৎসাহ দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভুল ত্রৰটির জন্য আমি সকলের কাছে ৰমা প্রার্থী।

জওশন আরা রহমান
জুন ২০০৮

সূচি

আজি হতে শতবর্ষ আগে ৪
বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ : ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায় ৭
ইউনূসের নোবেল প্রাপ্তি : বাংলাদেশে প্রথম সূর্যোদয় ১০
সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম ১২
বাঙালির সংস্কৃতি ভাবনা ১৫
তাই পবিত্র যা একান্ত ব্যক্তিগত ১৮
সমস্ত অর্জন আজ মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে ২১
সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন : সমাজতন্ত্রের পতন নয় ২৩
হুইটম্যানের দেশে মানবতার জয়গান ২৬
প্রিয় বন্ধু শামসুর রাহমান ২৯
অসাম্প্রদায়িক সাংবাদিকতার অগ্রপথিক আহমদুল কবির ৩২
জয় হোক সত্যের : জয় হোক দৈনিক সংবাদের ৩৪
ওয়াহিদুল হক : বাংলা সংস্কৃতির ক্লান্তিহীন পরিব্রাজক ৩৬
সিরাজুল ইসলাম সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কথা ৩৯
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর জন্মদিনের শুভেচ্ছা ৪০
সাহসী নাট্যকার আতিকুল হক চৌধুরীর মতো আমরা সবাই এখন অবরুদ্ধ ৪৩
ফুলের নামে নাম- শিমূল ৪৪
সোহরাব হাসানের কাছে লেখা চিঠি ৪৬
স্মৃতির আলোয় ঈদ ৪৮

ভাষণ / শুভেচ্ছা বাণী

জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপিত কবির ৮০তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ ৪৯
স্বরচিত কবিতার সিডির মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে কবির ভাষণ ৫১
অনন্যা সঙ্গীত একাডেমীর যুগপূর্তি উপলক্ষে ভাষণ ৫২
ক্রান্তির নতুন নির্বাহী কমিটিকে শুভেচ্ছা ৫৪
ওস্তাদ আজিজুল ইসলামের বাঁশি সন্ধ্যায় শুভেচ্ছা বাণী ৫৪
নিবেদন'র ১৬ তম বার্ষিকীতে শুভেচ্ছা ৫৫
আট-ই-ফাল্গুন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংসদ কর্তৃক সংর্বধনা অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা ৫৬

সাক্ষাৎকার

বঙ্গজ : সাহিত্য কখনো সমাজবিচ্ছিন্ন আকাশের কবিতা হতে পারে না ৫৬
ডেসটিনি : নিজের কাছে ফিরে যেতে চাই ৫৯
একুশে পত্রিকা : যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই ৬০

আজি হতে শতবর্ষ আগে

আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে
আজি হতে শতবর্ষ পরে!
আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ,
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ॥
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব কি পাঠাইতে
তোমাদের করে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে।

১৩০২ সালের ২রা ফাল্গুন যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তারপর শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে। তাঁর কবিতা, তাঁর গান আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে প্রতিদিন। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় আজও তার গান আমাদের আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের এক বিরাট বিস্ময়, মানব জীবনের এমন কোনো চিন্তা নেই, এমন কোনো ভাবনা নেই যেখানে তিনি বিচরণ করেননি। মানুষের চিরন্তন সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে ঘিরেই তাঁর গান। তাঁর চিন্তাধারায় আমরা চিন্তা করি, তাঁরই সুরে আমরা গান গাই, তাঁর ভাষায় কথা বলি। আসল কথা আমরা রবীন্দ্রনাথেই বাঁচি, রবীন্দ্রনাথেই মরি।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতীয়তাবোধের শ্রেষ্ঠ রূপকার। আমাদের রুচি ও সৌন্দর্যবোধের নির্মাতা। বাঙালি মাত্রই তাঁর মানস সন্তান। বাংলার মাঠ-ঘাট, আকাশ-বাতাস, বনভূমি, নদী, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত আর তাঁর তামাটে নর-নারীর জীবনকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। অনবদ্য সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতিতে যে মানবিক অনুভূতি, রূপ, রস ও রঙের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই, সেই কালাতীত সৌন্দর্য-প্রিয়তা রবীন্দ্রনাথই আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। তিনি তাঁর লেখায় বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যকে আমাদের চোখের সামনে তুলে না ধরলে আমরা হয়তো নান্দনিক দৃষ্টি দিয়ে স্বদেশকে উপলব্ধি করতে পারতাম না। তাঁর কাছেই আমরা প্রেমকে রোমান্টিক ধারায় বর্ণনাতীত করে তোলার ভাষা শিখেছি। বাসের ঘরকে যেমন বাগান দিয়ে সাজাতে হয়, বাসর-ঘরকে ফুল দিয়ে, মাঠে শস্যবীজ রোপণ করে যেমন সৌন্দর্য এবং প্রয়োজনকে সমন্বিত করতে হয়, তেমনি তিনি আমাদের সংস্কৃতিকে অপূর্ব মানস সম্পদে সাজিয়েছেন সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যধারার মাধুর্য দিয়ে।

আমাদের সঙ্গীত জগতের তিনি এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর সত্যদ্রষ্টা পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির গান শুনে গর্বভরে বলতেন, রবি আমাদের বাংলার বুলবুল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন– "একদিন আমার রচিত দু'টি পরমাত্মিক কবিতা শ্রীকণ্ঠ বাবুর নিকট শুনিয়া পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন। তাহার পরে বড় বয়সে আরেকদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম। একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলো গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটি গান 'নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে, রয়েছো নয়নে নয়নে'। পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়ামে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নতুন গান সবক'টি একে একে গাইতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দু'বারও গাইতে হইল। গান গাওয়া যখন শেষ হইল, তখন তিনি বলিলেন, দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে তো তাহার পুরস্কার দিতো। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই, তখন আমাকেই সেই কাজ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশত টাকার চেক আমার হাতে তুলিয়া দিলেন।"

রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে সৃষ্টির প্রথম রহস্য আলোকের প্রকাশ। আর সৃষ্টির শেষ রহস্য ভালোবাসার অমৃত। রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রবেশ করার মূল চাবিকাঠি তাঁর গান। এই গানে যেমন আছে বলিষ্ঠ উচ্চারণ, সাহসী প্রতিবাদ তেমনি ভক্ত হৃদয়ের বিস্ময়কর অভিব্যক্তি ও মর্মস্পর্শী আবেদন। যা কালকে অতিক্রম করে কালজয়ী হয়ে আছে আপন ঐশ্বর্যে, মাধুর্যে, স্বকীয়তায়। কথা ও সুরের এমন যথার্থ যুগলবন্দি আর কারো গানে পাওয়া যায় না।

স্বয়ং কবির ভাষায় ঃ "গানগুলো শুনলে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এই সুরগুলো কারো কাছে ধার করা নয়। কোথা থেকে এসেছে বলতে পারিনে। কিছু বাছ-বিচার, ভয়-ডর নেই। আপনার ইচ্ছামতো গলায় এসেছে, গেয়েছি, গান হয়ে উঠেছে। তাই ফিরে শুনি যখন বিস্মিত হই এবং আমি নিজেকে বলি, এই রইল তোমার গান, যা কাল হরণ করতে পারবে না।"

এই উক্তি তাঁর অহঙ্কার নয়, একান্ত বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের ভিত্তি ভূমি কত যে সুদৃঢ় তা উপলব্ধি করি, তাঁর মৃত্যুর পঁয়ষট্টি বছর পরেও যখন দেখি দুই বাংলায় তাঁর গান দিনে দিনে কত বিস্তৃত হচ্ছে। জনপ্রিয় হচ্ছে।

তাঁর সেই সঙ্গীত একবার শুনলে বার বার শুনতে ইচ্ছা করে। এর সুর ও বাণী এত একাত্ম, আমাদের চিন্তা-চেতনাকে প্রসন্ন করে, দীপান্বিত করে। আমাদের ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষকে বশীভূত করে রাখে অমিয় সুষমায়। আমাদের দেশপ্রেমকে সঞ্জীবিত করে তোলে আকাশ কাঁপানো জীবনমুখী সুরে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে ঘিরে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। যে যার দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের বিরাট কাব্য প্রতিভা থেকে স্বপক্ষ বা বিপক্ষ মত খাড়া করার জন্য বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়ে কখনো তাকে ঋষি বানিয়েছেন। কখনো নির্মমভাবে আঘাত করেছেন। রবীন্দ্রমত্তরা তাকে দেবতা বানিয়েছিলেন, রবীন্দ্রভক্তরা বানিয়েছিলেন মানুষ। আর বামপন্থী কিছু হঠকারী রাজনৈতিক ব্যক্তি তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের তমসায় আচ্ছন্ন কিছু মুসলিম সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী তাঁকে বলেছিলেন হিন্দুকবি। ১৯৪৪ সালে আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ মুসলমান শিল্পী-সাহিত্যক পাকিস্তানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রকাশ্যে সম্মেলন ডেকে বলেছিলেন, "বাঙালি সংস্কৃতি বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতি নয়। এ সংস্কৃতি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যুগের সংস্কৃতি। এটা খুবই উন্নত সংস্কৃতি হতে পারে, তবে এটা বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতি নয়। ত্যাগের আদর্শ, বৈরাগ্যের আদর্শ, ভক্তিবাদের আদর্শ, প্রেমের আদর্শ, সমস্তই উঁচুদরের আদর্শ। এই আদর্শকে বুনিয়াদ করে নারী প্রেমকে কেন্দ্র করে, হিন্দু শিল্প-সংস্কৃতি মনীষীরা যে সাহিত্য রচনা করেছেন, সে সবই হয়েছে খুবই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য এবং তা পড়ে অপর সকলের মতো, মুসলমান রস পিপাসুরাও পিপাসা নিবারণ করে। কিন্তু সত্য কথা এই যে, এ সংস্কৃতিকে মুসলমানরা জাতীয় সংস্কৃতি মনে করে না। কারণ, ত্যাগ-বৈরাগ্য-ভক্তি প্রেম যতই উঁচুদরের আদর্শ হোক, মুসলমানের তা জীবনাদর্শ নয়।" (আবুল মনসুর আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁস সম্মেলন, ১ ও ২ জুলাই ১৯৪৪, মূল সভাপতির ভাষণ)।

এ ধরনের বিরূপ ভাষণ কী করে এমন একজন উঁচু মাপের সাহিত্যিকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য এবং উঁচুদরের আদর্শ স্বীকার করার পরও ভাষণে বলা হয়েছে এটা মুসলমানের জাতীয় সংস্কৃতি নয়। উচ্চাঙ্গের এবং উঁচুদরের আদর্শ থেকে বাঙালি মুসলমানদের বঞ্চিত করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল বহু আগে। তারই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান হওয়ার দেড় বছরের মধ্যে এর জনক উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এই ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি মুসলমানকে বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত করে তাকে দরিদ্রতর করা। ভাষার ওপর আঘাত হেনে পূর্ব বাংলার মানুষের অগ্রযাত্রাকে সর্বদিক থেকে পঙ্গু করে দেয়া। পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ করে শোষণ করা।

বলা বাহুল্য, তখন বেশিরভাগ মুসলমান শিল্পী-সাহিত্যিকের আক্রমণের মূল কেন্দ্রীয় ব্যক্তি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সমস্ত রাষ্ট্রীয়যন্ত্রকে ব্যবহার করা হয়েছিল, কিভাবে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মন থেকে রবীন্দ্রনাথকে মুছে দেয়া যায়। তখন রেডিও, পত্র-পত্রিকাসহ সব ধরনের গণমাধ্যম সরকারের হাতে। অর্থ-বিত্ত পাকিস্তানের তমসায় আচ্ছন্ন সব ধনী ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারা মিথ্যা প্রচার এবং বল প্রয়োগের মধ্যদিয়ে চেষ্টা করেছিলেন বাঙালি মুসলমানকে সংস্কৃতির মূলধারা থেকে বিযুক্ত করতে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে– হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের ঐক্য বিনষ্ট করা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ছিল অসাম্প্রদায়িক ও মানবতার শক্তিশালী প্রতীক এবং তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের পথে প্রবল প্রতিবন্ধক। তাই এই আক্রমণের মধ্যদিয়ে আমাদের মন থেকে তাঁকে এবং তাঁর সাহিত্যকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল পাকিস্তানবাদীরা। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রাণশক্তি এতই প্রবল যে, তাকে শত চেষ্টা করেও আমাদের অন্তর থেকে মুছে ফেলা যায়নি।

নজরুলকে ছেটে কেটে মুসলমানি লেবাস পরিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা চলেছে বহুদিন। পাঠ্যক্রম থেকে পুরোপুরি বাদ দিতে না পারলেও আসল রবীন্দ্রনাথকে যতখানি মর্যাদা দেয়া উচিত ছিল, সে মর্যাদা দেয়া হয়নি। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিকে উপেক্ষা করে অচিরেই রবীন্দ্রচর্চার আগ্রহ জেগে ওঠে বাঙালি মুসলমানের মনে। বাঙালি হওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনে রক্ত দিয়ে বাঙালি মুসলমান ঐতিহ্য সন্ধানী হয়ে ওঠে। এই ঐতিহ্যের উজ্জ্বলতম শীর্ষ বিন্দুতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের বাঙালি জাতীয়বোধকে খর্ব করতে গিয়ে পাকিস্তানপন্থীরা বার বারই আঘাত করেছে রবীন্দ্রনাথকে। বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের সময়সীমা কমিয়ে দেয়া হয়। অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীকে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত আখ্যা দিয়ে বেতারে তাদের কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। এভাবে রবীন্দ্রনাথকে যতই আঘাত করা হয়েছে ততই বাঙালির মন-মানসিকতায় তিনি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। কবির ভাষায়– ওরা যতই গর্জাবে, ভাই, তন্দ্রা ততই ছুটবে,/ মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে॥/ ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,/ ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা ততই যে ঢেউ উঠবে।

১৯৬১ সালের রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর পর থেকে আমাদের অনুভূতি আরো জাগ্রত হতে থাকে। রবীন্দ্র চর্চা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা আরো বেগবান হয়ে ওঠে। এই ব্যাপারে ছায়ানটের উদ্যোগ এবং চট্টগ্রামে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ ও গীতবিতানের উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়।

১৯৬৭ সালে বেতারে তাঁর গান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর বিরুদ্ধে প্রায় উনিশজন কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদ করে একটি বিবৃতি প্রচার করেন। আবার সরকারের এই নিষিদ্ধকরণকে সমর্থন জানিয়ে চলিৱশজনের একটি বিবৃতি প্রচার করা হয়। এই স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন সাজ্জাদ হোসেন, কবি ফররুখ আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ মাহফুজউলৱাহ প্রমুখ। তাদের বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ইকবাল আর নজরুলই আমাদের আদর্শ এবং চেতনার প্রতিবেশী। অমুসলমান রবীন্দ্রনাথ নয়। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবোধের দুরন্ত জোয়ারে এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। তাঁর গান আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে হাতিয়ারে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের অন্যতম জাতীয় কবির আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর গান এখন আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। এমন সৌভাগ্যবান কবি পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। যার গান দুটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সাধনা ছিল মনুষ্যত্বের সাধনা। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনকালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার এসেছিল, সমাজে-রাষ্ট্রে দিন-বদলের যে হাওয়া লেগেছিল তার সমস্তটাই তিনি আপন হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর সৃষ্টিশীল লেখা ও কর্মোদ্যমের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতিকে আরো সমৃদ্ধ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ তাঁকে জন্ম সূত্রে পেয়েছে, আর আমরা লড়াই করে রবীন্দ্রনাথকে অর্জন করেছি। সমস্ত দুঃখ-বেদনা, আঘাত-অভিঘাত, বিপদ ও সংকটে তিনি আমাদের সহায়। দেশ ও কালের সীমানা পেরিয়ে তিনি এখন বিশ্ব বিবেকে পরিণত এক গৌরীশৃঙ্গ।

৪ মে ২০০৭

বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ
ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়

বাংলার নবজাগরণের শীর্ষ বিন্দুতে যার স্থান, ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়ের বর্ণাঢ্য জীবনের কথা, সমাজ সংস্কারের কথা, তার সেই অসাধারণ জ্ঞানের কথা, পুণ্যতম মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনার কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। তিনি বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত ভাষা ছাড়াও ফারসি, উর্দু, আরবি, ল্যাটিন, ফরাসি, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষা জানতেন। এসব ভাষায় তিনি বহু প্রবন্ধ এবং বিস্ময়কর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি কোরআন শরীফও অনুবাদ করেছিলেন। দেশের সকলকে সত্যের চেতনায় উজ্জীবিত করার জন্য তিনি বাংলা ভাষা ও গদ্য সাহিত্যের উন্নতির কাজে হাত দিয়েছিলেন। বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপনে ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের দান যেমন অপরিসীম, তেমনি বাংলা গদ্য রচনায় রামমোহনের কীর্তিও অসামান্য। জটিল বিষয় সহজ করে প্রকাশ করার গদ্যরীতি তিনিই প্রচলন করেছিলেন। সেই যুগে বাংলা গদ্যে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য থাকায় সাধারণ লোকদের তা বুঝতে কষ্ট হতো। তিনি এই গদ্যরীতির বিরোধী ছিলেন। তিনি এমনভাবে লিখতে চেষ্টা করতেন যাতে তার লেখা সাধারণ লোকের বোধগম্য হয়। বাংলা গদ্যে গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনার পথিকৃৎও রামমোহন। তিনি পুরাতন সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহকে সরল ভাষায় প্রকাশ করে যেমন ভাষার ভাব ও শব্দ সম্পদ সমৃদ্ধ করেছিলেন তেমনি জটিল বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি প্রকাশভঙ্গির দৃঢ়তায় মননশীলতায় এবং বিষয় নির্বাচনের দক্ষতায় বাংলা গদ্যকে সতেজ ও পুষ্ট করেছিলেন।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের আরেকজনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রামমোহনের গদ্যরীতির ভূয়সী প্রশংসা করতেন। তিনি রামমোহন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন, "সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, উর্দু, ল্যাটিন, হিব্রু, গ্রিক, ইংরেজি, ফরাসি– এই নয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও বিলক্ষণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া তাহার গদ্য রচনা খুবই সতেজ এবং প্রাঞ্জল। তিনি এ দেশের একজন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।"

রামমোহনকে আমরা সাধারণত ধর্ম সংস্কারক হিসেবে জানি। কিন্তু তিনি ছিলেন অসাধারণ সমাজ সংস্কারক। সতীদাহের মতো কুপ্রথা রোধ করে নারীকে জ্বলন্ত চিতার অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করে তিনি সমাজে নারীর বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সহমরণ, বাল্যবিবাহ, কুলীনপ্রথা, বহুবিবাহ, বিবাহ সংস্কার, বিধবা বিবাহ, নারীর সম্পত্তির অধিকার, স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠা এবং পণপ্রথা বিলুপ্তির জন্য আমরণ সংগ্রাম করেছেন। এ সময় তাঁর সতীদাহ প্রথা আন্দোলন সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৮৩০ সালে রামমোহন ব্রহ্মসভা স্থাপন করে একেশ্বরবাদের পক্ষে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। তিনি নিজে অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন এবং যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রচার করতেন একেশ্বরবাদই প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের অনুমোদিত আদর্শ। তিনি যেমন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, তেমনি নিজেকে কোনো সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতি বিধান করা ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত।

তাঁর সময়কালে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল হুগলিতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন (১৭৭৮), ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ (১৭৮০), কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা (১৭৮১), এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা (১৭৮৪), বারনসীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৭৯২), ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮০০), আত্মীয়সভা (১৮১৫), হিন্দু কলেজ (১৮১৭), কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭), কলকাতা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮), বাংলা পত্রিকা প্রকাশ (১৮১৮), বিশপ্‌স্ কলেজ (১৮২০), সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪), একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (১৮২৮)। এ সমস্ত জ্ঞানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা নবজাগরণের সূচনা হয় এবং রামমোহন ছিলেন এই নবজাগরণের আদি পুরুষ।

কলকাতা এসে রামমোহন তাঁর এই একেশ্বরবাদ প্রচার এবং প্রসারের জন্য প্রথমে আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই আত্মীয়সভা ব্রাহ্ম সমাজে পরিণত হয়। রামমোহনের ব্রাহ্ম সমাজ একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে স্থাপিত হয়নি। ব্রাহ্ম সমাজের কার্যকলাপ শুধু ধর্মালোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর এই ধর্ম আন্দোলন ভারতের ভিন্ন ধর্ম-মত ও ধর্ম সম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি মর্যাদাশীল করে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তিনি মনে করতেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জ্ঞান-সাধকেরা যদি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে ব্রাহ্ম সমাজে সম্মিলিত হন এবং নিজ নিজ ধর্মের মধ্যে যে সনাতন ও সার্বজনীন সত্য আছে এবং যে উদারতার বাণী আছে, তা আলোচনা করেন তাহলে হিন্দু সম্প্রদায় দেখবে যে মুসলমানদের মধ্যেও তাদের নিজের শাস্ত্র সাধনার অনেক সত্য আছে। মুসলমানরাও দেখবেন যে হিন্দু ধর্মের সঙ্গেও তার শাস্ত্র ও সাধনার অনেক মিল আছে। সে রূপ খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ও অপরাপর ধর্মাবলম্বীরাও অনান্য ধর্মের শ্রেষ্ঠতম মর্মবাণীর আভাস পেয়ে সকল ধর্মের প্রতি মর্যাদাশীল হয়ে উঠবেন। এভাবে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি ধর্মের চিন্তানায়ক, উদার সাধকরা পরস্পরের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সম্মিলিত হওয়ার সুযোগ পেলে একে অন্যের ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান পাবেন। একে অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন। একেই রামমোহনের ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠার নিগূঢ় উদ্দেশ্য বলে মনে করাই যথার্থ। ব্রহ্মসভাকেই যদি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের চিন্তানায়ক ও সাধকদের একটা মিলনক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে সকল ধর্মের সাধারণ মানুষের মধ্যেও একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পরস্পরের আচার-অনুষ্ঠানাদির সম্বন্ধে যে সকল পার্থক্য আছে, তা জনসাধারণ উদারভাবে গ্রহণ করবে। এভাবে ভারতবর্ষে বিরাট জাতীয় একতা সৃষ্টির আশা নিয়ে রাজা রামমোহন তাঁর ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই তাঁর এ ধর্ম আন্দোলনকে হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ না ভেবে মানবধর্ম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হিসেবে চিন্তা করাই সকল দিক থেকে বাঞ্ছনীয়। রামমোহন যেই সত্য নানা ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করে যুক্তি ও বিচার বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন

তাকে বলেছেন টহরাবৎংধষ জবষরমরড়হ, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি থেকে অনুভবের দ্বারা সেই সত্যের নাম দেন জবষরমরড়হ ড়ভ গধহ-মানবধর্ম – তা হিন্দু ধর্ম নয়, মুসলমানের ধর্ম নয়, খ্রিষ্টান ধর্ম নয়, সমগ্র মানবজাতির ধর্ম।

রাজা রামমোহন রায় বহু আগেই উপলব্ধি করেছিলেন হিন্দু-মুসলমানের মিলন ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয়। সে জন্যই তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনকে এত গুরুত্ব সহকারে প্রাধান্য দিয়েছিলেন তাঁর ধর্মীয় আন্দোলনে। তিনি এর দ্বারা ইসলাম ধর্মের মর্মবাণীকে স্বীকার করে নিয়েছেন। হিন্দু ধর্মের অতীতের শাশ্বত সত্যকেও অস্বীকার করেননি। নবীনদের যুক্তিবাদী চিন্তাধারাকেও অগ্রাহ্য করেননি। মানবতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলনকে শক্ত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তার রচিত তুহফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদীন ইসলামের উদারনৈতিক আদর্শে রচিত। খোলাফায়ে রাশেদীনের রাজত্বের পরে ইসলামের মতবাদ দুটি ভিন্নধারায় প্রবাহিত হয়। একটি মোতাজল ও অপরটি সুফিবাদ – একদল যুক্তিবাদী, অপরদল ভক্তিবাদী। বলা বাহুল্য, ইসলামের দর্শন চিন্তায় তিনি এই দুই মতের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন।

সকল প্রকার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বহির্ভূত রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি তার যে ভালোবাসা ছিল সেটা ভৌগোলিক পরিসীমা অতিক্রম করে সমস্ত মানব সমাজকে উদারভাবে আলিঙ্গন করেছিল। তার আদর্শ অনুসারে কোনো জাতির পক্ষে অন্য কোনো জাতির স্বাধীনতা হরণ সম্পূর্ণ অনুচিত। পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষ যাতে এই আদর্শ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য তিনি বিশ্বের মানবজাতির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। উইলিয়াম অ্যাডামসের ভাষায় এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তিনি লেখেন– He did not seek to limit the enjoyment of it to any class, or colour, or race, or nation or religion. His sympathies embraced all mankind.

এই কারণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পৃথিবীর যেখানে যেখানে যত রাজনৈতিক সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল তার প্রতি রামমোহন রায়ের ছিল সুতীব্র আগ্রহ ও গভীর সমর্থন। ১৮১২ সালের ১১ আগস্ট জেমস বাকিংহামকে লেখা রামমোহনের চিঠিতে উলেৰখ আছে – শোচনীয় এই সব সংবাদ থেকে এই সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হচ্ছি যে, আমার জীবদ্দশায় আমি স্বাধীনতাকে অধিষ্ঠিত দেখে যেতে পারব না সারাবিশ্বে, বিশেষত ইউরোপীয় জাতিগুলোতে ও তাদের পদানত এশীয় উপনিবেশগুলোতে। স্বাধীনতার শত্রু ও স্বেচ্ছাচারের মিত্র যারা, কখনো তাদের জয় হয়নি এবং হবে না।

তাঁর এসব সংস্কারমূলক কাজে কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এত উত্তেজিত হয়েছিল যে, এক সময় তাঁর প্রাণনাশেরও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অকুতোভয় রামমোহন এ সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে প্রকাশ্যেই চলাফেরা করতেন। জীবনে ভীত হয়ে কোনোদিন তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।

রামমোহনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, পশ্চিমের বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, উদারনৈতিক যে রেনেসাঁসের সূচনা করেছিল তিনি তাতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং পরবর্তীতে হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের ত্রিশ দশক থেকে পরবর্তী চলিৰশ বছর পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়, রামমোহনকে তার জনক বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বেকন, লক, বার্কলে, হিউম, রিট, স্টুয়ার্ট প্রমুখ মনীষী ও চিন্তানায়কদের রচনা পাঠ করে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা যে নতুন জ্ঞানরাজ্যের সন্ধান পান এবং যার ফলে বাংলার শিক্ষিত মানুষের মধ্যে যে বিপৰবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তারও কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তা-ভাবনা। বলা যেতে পারে তিনি ছিলেন পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞান সাধনার একটি স্বর্ণ সেতু।

পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে–
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞান আদান-প্রদানের যে আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয়েছে, এর পেছনেও ছিল ভারতপথিক রামমোহনের চিন্তাধারা।

ফরাসি বিপৰবের দর্শনে উদ্বুদ্ধ রামমোহন চেয়েছিলেন যুক্তিবাদী নবভারত গঠন। এই মহান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে তিনি ফরাসি বিপৰবের মর্মবাণী– স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীকে ভিত্তি করে ভারতের ধর্মীয় সামাজিক সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। মানুষ ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি রামমোহন ছিলেন বিশেষ অনুরাগী। তিনি তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে নাগরিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। নাগরিক অধিকার বলতে তিনি বোঝাতেন মানুষের জীবন, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সম্পত্তি রক্ষা, স্বাধীন ধর্ম গ্রহণ, পালন, প্রচার, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মানুষের জীবনের নিরাপত্তা। তিনি এটাও বুঝতেন দায়িত্ব পালন ছাড়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই তিনি নাগরিকদের দায়িত্ব পালনের কথাও এই প্রসঙ্গে উলেৰখ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, বিচার ব্যবস্থার পুরোপুরি সংস্কার না করলে প্রচলিত আইনের দ্বারা জনসাধারণের কোনো মঙ্গল হবে না। তাই ভারতে আইনের শাসন প্রচলনের উদ্দেশ্যে প্রচলিত আইনের সংশোধনও দাবি করেছিলেন।

রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার শুধু পক্ষপাতি ছিলেন না, তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে যখন সংবাদপত্রের জন্য সরকারের নিকট হতে লাইসেন্স নিতে হবে এই আইন প্রবর্তিত হয় তখন তিনি এই আইন নিষ্প্রয়োজন ও অসম্মানজনক মনে করে এর প্রতিবাদে সরকারের প্রধান সচিবের কাছে একটি প্রতিবাদলিপি পাঠান। শুধু তাই নয়, তিনি এই আইন বাতিলের জন্য সুপ্রিম কোর্টেও আবেদন জানিয়েছিলেন। বিচারপতি তাদের আবেদন খারিজ করে দিলেন এই বলে : ওভ বি ধৎব ঃড় যধাব ধ ভৎবব পড়হংঃরঃঃরড়হ, যিরপয বি যধাব হড়ঃ ষবঃ ভৎবব ঢ়ৎবংং ভড়ষষড়ি রিঃ, হড়ঃ ঢ়ৎবপবফব রঃ.

তাতেও তিনি দমে যাননি। ইংল্যান্ডের রাজার কাছেও একটি আপিল পাঠালেন। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিলও তাঁর আবেদন বাতিল করে দেয়। এর প্রতিবাদে তিনি তাঁর ফারসি ভাষায় প্রকাশিত মিরাৎ-উল-আখ্বারের প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। তিনি লেখেন – 'অবৈধ ও স্বেচ্ছাচারীর সরকারের অধীন হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়'। তাঁর এই উক্তি আমাদের ইতিহাসে শাশ্বত বাণী হয়ে বহু বছর টিকে থাকবে যতদিন না মানুষ স্বৈরাচারী শাসন থেকে মুক্ত হতে পারে।

রামমোহন সম্পর্কে মার্কস্‌বাদী চিন্তাবিদ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন– 'রামমোহন রায়ের আস্তিক্যবাদ থেকে পরবর্তীকালের নাস্তিকতাবাদ হলো নতুন এক ধাপ। ফরাসি পণ্ডিতদের ন্যায় স্বাধীন তত্ত্বজিজ্ঞাসু মননীলতার যে সূত্রপাত তিনি করে গিয়েছিলেন, বাংলাদেশের পরবর্তী যুগের লোকেরা তা গ্রহণ করেছিল। তাঁরা ফরাসি বিপৰ্বের শিক্ষাও বিস্মৃত হননি। রামমোহনের পরবর্তীকালের শিষ্যরা বাস্তিলের পতন দিবসে অক্টারলোনী মনুমেন্টের ওপর ফরাসি ত্রিবর্ণ পতাকাও উড্ডীন করেছিলেন।'

পলাশী যুদ্ধের ১৭ বছর পর ১৭৭৪ সালে হুগলি জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের রাধানগর গ্রামে এক সম্পন্ন বাঙালি পরিবারে রামমোহনের জন্ম। ১৮৩২ সালের শেষের দিকে তিনি প্যারিস যান। সেখানে ফরাসি সম্রাট লুই ফিলিপ কর্তৃক সম্বর্ধিত হন। ইংল্যান্ডে ফিরে ব্রিস্টল শহরে মাত্র আটদিনের জ্বরে তাঁর মৃত্যু হয়, ১৮৩৩ সালে।

তাঁর ৫৯ বছর জীবনে প্রায় চৌদ্দ বছর গ্রামে কাটে। ইংরেজের জমিদারি পরিচালনা এবং ভ্রাতৃ কলহ, মামলা-মোকদ্দমায় কাটে প্রায় দশ বছর। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অসামান্য কীর্তির অধিকারী হয়েছেন। ঊনচলিৰশটি ইংরেজি রচনা ছাড়াও তিনি প্রায় ত্রিশটি বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ব্যাকরণ, ভূগোল এবং জ্যামিতির ওপর কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেন।

হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।
মৃত্যু অন্তরাল ভেদি দাও তব অন্তহীন দান
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নবপ্রাণ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
এনে দিক উদ্বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব।

–রবীন্দ্রনাথ

দৈনিক সংবাদ, ১৪ এপ্রিল ২০০৭

ইউনূসের নোবেল প্রাপ্তি : বাংলাদেশে প্রথম সূর্যোদয়

ক্ষুধায় অন্ন নেই, পরিধানে বস্ত্র নেই, রোগে চিকিৎসা নেই, শিক্ষার সুযোগ নেই, মাথার ওপর ছাদ নেই, শিশুর পুষ্টি নেই– এই সংবাদ পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবাদ। মুহাম্মদ ইউনূস তার চিন্তাপ্রসূত যে সংবাদ মানুষকে দিলেন– এই ব্যবস্থা ভাগ্য বিধাতার অমোঘ নির্দেশ নয়, ইচ্ছা করলেই মানুষ তার ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে।

তিনি শ্রেণীকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৭৫ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে জোবরা গ্রামে এক জরিপ চালিয়ে জানতে পারলেন গরিব নারীদের উপার্জন প্রায় ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পরিণত হয়। এই নারীদের যারাই উপার্জন করেন, দেখা গেল তারা এই উপার্জনের জন্য কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। এরা যে সমস্ত জিনিস তৈরি করেন, তা নামমাত্র মূল্যে ছোট ছোট ব্যাপারীদের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। কারণ অর্থের জোগান না থাকায় ব্যাপারীদের কাছ থেকে এই দ্রব্য সামগ্রীর উপকরণ বাঁশ বা বেত কেনার জন্য তাদের অগ্রিম টাকা নিতে হয়। ফলে বাধ্য হয়ে নামমাত্র মূল্যে তাদের কাছে জিনিসপত্র বিক্রি করে দিতে হয়। ইউনূস হিসাব করে দেখলেন ওরা যা বানায়, তা থেকে পারিশ্রমিক বাবদ আয় থাকে খুবই সামান্য। এ দিয়ে তাদের সংসার চলে না। অন্যের বাড়িতে এরা ধান ভানতে গিয়ে সারাদিনে একবেলার খানা, আধা সের চাল পায় তাতেও সংসার চলে না। নিজে ধান কিনে ভানতে পারলে দৈনিক ২০/২৫ টাকা লাভ হয়। কিন্তু পুঁজি নেই বলে সে ধান তারা কিনতে পারে না। পরের তাঁতে কাপড় বুনলে সারাদিনে ২৫ টাকা মজুরি। নিজের তাঁতে বুনলে একই পরিশ্রমে ৪৫ টাকা আয়। কিন্তু পুঁজি না থাকাতে তারা সুতা কিনতে পারে না। ফলে মহাজনদের হাতে ঘর-বাড়ি বন্ধক রেখে যে উচ্চ সুদ দিতে হয়, তাতে পোষায় না।

ইউনূস ভাবলেন, এই পুঁজিটা যদি তাদের সরবরাহ করা যায়, তাহলে নিজের পরিশ্রমের আয় নিজে ভোগ করার একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে। পুঁজির মালিকরা বিশেষ সুবিধার অধিকারী হওয়ায় গরিব মানুষের শ্রমের ফসল অনায়াসে কেড়ে নিয়ে যায়। ক্রমাগত এই বঞ্চনার ফলে মুষ্টিমেয় লোক দিনে দিনে সম্পদশালী হতে থাকে, আর একদল লোক নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে পড়ে। যেহেতু এই গরিব লোকেরা বড় বড় ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার অধিকার বঞ্চিত। কাজেই গরিব লোকেরা জামানত ছাড়া ব্যাংক থেকে কোনো পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে না। আর এসব ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হলে হাজারো রকম আনুষ্ঠানিকতা আছে। সেই আনুষ্ঠানিকতার শর্ত পূরণ করার মতো শিক্ষা এবং সামর্থ্য কোনোটাই এই গরিব লোকদের নেই। এদের শতকরা আশিজন নিরক্ষর।

প্রফেসর ইউনূস এই বাধাগুলো অতিক্রম করে কিভাবে গরিবদের অর্থ জোগান দেয়া যায় সেই চিন্তায় মগ্ন হলেন। সনাতন ব্যাংকিংয়ের সমস্ত নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে কোনো জামানত ছাড়া গরিব লোকদের ঋণ সুবিধা দেয়ার জন্য জোবরা গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প শুরু করেন। এতে তারা মহাজনের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেলেন, নিজের আয়ের পথ নিজেরাই বের করে নিতে সক্ষম হলেন এবং নিজেদেরকে একটা সংগঠনের আওতায় আনলেন। যার প্রভাবে তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে উঠল। সুযোগের দ্বার অবারিত হলো। এই প্রকল্পের নীতি হিসেবে ঠিক করা হলো : গরিব মানে পুরুষ নয়, গরিব মহিলা ও পুরুষ। মানুষ ব্যাংকের কাছে আসবে না। ব্যাংক মানুষের কাছে যাবে।

উলেৰখ্য, গ্রামীণ ব্যাংক শুধু ভূমিহীনদের সাথে ব্যাংকিং ব্যবসা করে। যে সমস্ত পরিবারে মোট আবাদি জমির পরিমাণ চলিৰশ শতকের কম তারাই ভূমিহীন বলে গণ্য হয়। এভাবে জোবরা থেকে টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইল থেকে একাত্তর হাজার গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক দারিদ্র্য মোচনের নীতি অনুযায়ী ঋণ প্রদানে গরিব নারীদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ড. ইউনূস বলেন, দুবেলা স্বামীর, শ্বশুরবাড়ির কিংবা যে বাড়িতে খেটে খান সে বাড়ির গঞ্জনা সহ্য করার জন্যই যেন নারীদের সৃষ্টি। অথচ সাংসারিক এমন কোনো কাজ নেই যা তিনি করতে জানেন না বা করেন না। সাংসারিক নানা কাজকর্মের যে দক্ষতা তিনি অর্জন করেন সে দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অনায়াসে কাজে লাগিয়ে তিনি বা তারা অর্থ উপার্জনের অন্যান্য ক্ষেত্রে লাগাতে পারেন। তাদের বানানো পিঠা, চানাচুর, মিষ্টি বাজারে অনায়াসে বিক্রি হয়। বাঁশ, বেতের নানা কাজ যেমন কুলা, চালুন, ডোল, ঝুঁড়ি, পাটি, পাখা ইত্যাদি তৈরি। হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন, নানা রকম শাকসবজির চাষ, ফলের চাষ প্রতিটি জিনিসই নারীদের উপার্জনের পথ খুলে দিয়েছে। পাড়ার মধ্যে নিজের বাড়িতে ছোটখাটো মুদির দোকান দিয়ে বসা, এটাও দেখা যাচ্ছে এখন অনেক গ্রামে।

নারীরা উৎপাদনে, উপার্জনে সক্ষম নয় এই সনাতনী বিশ্বাস উড়িয়ে দিয়েছে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প। গ্রামীণ ব্যাংকের আওতাধীন একাত্তর হাজার গ্রামে এক বিপৰবের সৃষ্টি করেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণগ্রহীতার সংখ্যা প্রায় ৬৬ লাখ। এদের মধ্যে গ্রামীণ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করছে কয়েক লাখ মহিলা। গ্রামীণ ব্যাংকের মোট সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৯৭ ভাগ নারী এবং ৩ ভাগ পুরুষ। ১৯৭৬ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পুঁজি বিতরণ করা হয়েছে ২৯ হাজার কোটি টাকা। এখন গ্রামীণ ব্যাংকের আওতাধীন পুরুষ এবং নারী শুধু ঋণ নেয়ার মধ্যে তাদের কর্ম সীমিত করেনি। তারা যৌতুক দেব না, যৌতুক নেব না– ধরনের ষোল সিদ্ধান্ত পালন করে, ফুটানো বিশুদ্ধ পানি পান করে এবং প্রতি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। পৃথিবীর ৩১টি দেশে গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে রেপিৰকা রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশ চীনও দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের রেপিৰকা গ্রহণ করেছে। অর্থ, পরামর্শ এবং দক্ষ লোকবল দিয়ে এসব দেশকে সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়।

ইউনূসের এই গ্রামীণ প্রকল্পকে আমি একটি দর্শন কিংবা মতবাদ বলে বিভিন্ন সময় উলেৰখ করেছি। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এটাকে একটি মতবাদ বা দর্শনের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এই দর্শনের মূল কথা দরিদ্র মানুষের মধ্যে এক বিরাট সম্ভাবনা শক্তি লুকিয়ে আছে। সেই সম্ভাবনাকে সুযোগের মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারলে তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে।

শুধু বড়লোকেরা ব্যাংকের ঋণ পাওয়ার সুবিধা ভোগ করে এবং তাদের ঋণখেলাপির সংখ্যা শতকরা প্রায় ৭০-৭৫ ভাগ। গরিব লোকের ঋণ পাওয়া তাদের একটি মানবিক অধিকার। এই অধিকারের প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে গ্রামীণ ব্যাংক। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের ঋণখেলাপির সংখ্যা শতকরা .০৯ ভাগ। এতে গরিব লোকদের শ্রেয়বোধ বড়লোকদের চেয়ে অনেক বেশি, তা প্রমাণ হয়।

গ্রামীণ ব্যাংকের দারিদ্র্য মোচনের নীতি কর্মসংস্থান নীতির চেয়ে অনেক ব্যাপক, অনেক গভীর। সেই নীতি এমন যেন, মানুষ তার ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে পারে। সেই নীতিকে হতে হবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতিসমূহের সুসামঞ্জস্য ও সমন্বিত রূপ।

দেশের দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ স্বামী নিঃগৃহীতা, পরিত্যক্তা, তালাকপ্রাপ্ত, অ্যাসিডদগ্ধ, নির্যাতনের শিকার ও যৌতুকের করাল গ্রাসের শিকার। গ্রামীণ দর্শনে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় গ্রামীণ আওতাভুক্ত নারীদের ব্যক্তিসত্তা এবং ক্ষমতায়নকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গেছে। সমাজে এরা এখন মানুষ হিসেবে সম্মানিত।

এই ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের সন্তানদের অনেকে এখন উন্নত পেশায় নিয়োজিত। কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ শিক্ষক, কেউ তথ্য প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। এ কারণে সমাজে তাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের ব্যাপারে ড. ইউনূসের সুচিন্তিত মতবাদের দর্শন এবং এর সার্থক প্রয়োগ বিশ্ব সমাজকে বিস্মিত করেছে। ইউনূসের এই মতবাদ মনে হয় একটি বিশ্ব ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত হবে। চীনের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশেও এই মতবাদকে দারিদ্র্য মোচনের নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

ড. ইউনূসের নোবেল প্রাইজ বিজয়ের মধ্য দিয়ে তার মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পেল। তার ব্রতের গৌরবে আমরা আনন্দিত। গোটা দেশ তার কীর্তির আলোয় আলোকিত।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে আবেগে আপৰুত হয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন- এবার যাত্রা হলো শুরু। হৃদয়ের ভাষায় দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন, যাদের রক্তের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীন হয়েছে, তাদের কাছে আমাদের অনেক ঋণ– অনেক অঙ্গীকার। আজ আনন্দের দিন, উৎসবের দিন। যাদের রক্তের বিনিময়ে এ দেশ পেয়েছি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার সামান্য নিদর্শনস্বরূপ এ দেশের জন্য নোবেল পুরস্কার আনতে পেরেছি। তিনি আগামীদিনের শপথ নিয়ে আরো বলেছেন, এই শহীদ মিনার সামনে রেখে প্রতিজ্ঞা করছি, তাদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না। আরো বহু গৌরবের সংবাদ এনে দিয়ে ক্রমাগত আমরা এই জাতিকে সমৃদ্ধ করবো।

ড. ইউনূস কাজের লোক। তার উদ্ভাবনা শক্তি প্রখর এবং ঈর্ষণীয়। নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে প্রফেসর ইউনূস জানালেন ক্ষুদ্রঋণের সফলতার পর তার পরবর্তী লক্ষ্য সামাজিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো। নোবেল পুরস্কার হিসেবে পাওয়া ১.৭ মিলিয়ন ডলার অর্থ তিনি সামাজিক বাণিজ্যিক উদ্যোগ খাতে ব্যয় করার ঘোষণা দেন। দরিদ্র মানুষ ও শিশুদের জন্য পুষ্টি চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে গ্রামীণ দুধ ও চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করবেন বলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য হাসপাতাল তৈরির কথা বলে তিনি জানালেন-সেখানে সবার জন্য একই ধরনের চিকিৎসা থাকবে। কিন্তু মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী ফি দেবে। যার সামর্থ্য বেশি সে বেশি ফি দেবে। আর যার টাকা নেই তাকে বিনা খরচে চিকিৎসা দেয়া হবে।

প্রফেসর ইউনূস দীর্ঘদিন লড়াই করে পরিশ্রম মেধা এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিলে তিলে যে স্বপ্নকে বৈজ্ঞানিক সত্যের মতো বাস্তব রূপ দিলেন, তার জন্য নোবেল পুরস্কার কিছুই না। কিন্তু আমাদের জন্য, যারা অন্ধকারে আছি, তাদের জন্য এই নোবেল প্রাইজ একটি আলোকের দীপ্তি, বাংলাদেশে প্রথম সূর্যোদয়।

দৈনিক সমকাল, ১৮ অক্টোবর ২০০৬

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম

১৯৪৬ সালে বাংলাদেশে, এমনকি ভারতবর্ষে, রাজনৈতিক অবস্থা তখন চরমে– সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ব্রিটিশ ভেদনীতির সফল প্রয়োগে জাতি বিভ্রান্ত। এমন সময় আমরা ক'জন তরুণ চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম নজরুল জয়ন্তী উদযাপন করি। এই নজরুল জয়ন্তী উদযাপন করার লক্ষ্যে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে অধ্যাপক আবুল ফজলকে সভাপতি এবং আমাকে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

এই নজরুল জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আমরা বেশ কিছুসংখ্যক তরুণ কর্মী 'খুরশীদ মহল' সিনেমা হলের তিন তলায় মহড়ায় মিলিত হতে থাকি নিয়মিত। মহড়ায় যারা আসতেন তাদের মধ্যে ছিলেন তেজেন সেন, বঙ্কিম সেন, সুচরিত চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশ, চিরঞ্জীব দাশ শর্মা, তখনকার চট্টগ্রাম জেলা জজ শৈবাল গুপ্তের ছেলে পার্থ সারথি প্রমুখ। আরো হয়তো কেউ কেউ আসতেন– যাদের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

১৯৪৬ সাল ছিল অবিভক্ত বাংলাদেশে একটা অভিশপ্ত বছর। কলকাতায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা প্রকট আকার ধারণ করেছে। তার প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের দু'-একটি জেলায় দেখা দিয়েছে। চট্টগ্রামেও স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দল এই অবস্থার সুযোগে দাঙ্গা বাঁধাবার চেষ্টা চালাচ্ছে।

নজরুল জয়ন্তী উদযাপনকে উপলক্ষ করে আমরা একটা বড় ধরনের সমাবেশ করি। আমাদের এ ধরনের কার্যকলাপ তখন তরুণ এবং প্রবীণদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল।

আমরা এই উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ধরে রাখার এবং আরো চলমান করার প্রচেষ্টায় সিদ্ধান্ত নিলাম যে, একটি মাসিক পত্রিকা বের করব।

এই মাসিক পত্রিকার মূলনীতি হবে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ এবং আমরা এর চেয়ে বেশি কিছু চেয়েছিলাম– 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই কথাটি যেমন মানবতাবাদের বিশেৱষণ করে, তেমনি আমরা এটাকে শ্রেণীগত বিশেৱষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। আমরা এ দাবিও করেছিলাম যে, শিল্প-সাহিত্যকে রাজনীতির হাতিয়ার হতে হবে। আমাদের এ দুঃসাহসিক দাবি তখনকার অনেক উদারনৈতিক সাহিত্যিক স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ এই দাবির পেছনে হয়তো আমাদের কোনো কৌশল থাকতে পারে। আমাদের বুকে যে আগুন ছিল, সে আগুনের উত্তাপকে কিন্তু তারা অস্বীকার করতে পারেননি। একটা নতুন সমাজ তৈরি– যেখানে শ্রেণীভেদ থাকবে না, কোনো বর্ণ ভেদ থাকবে না, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে না– এ ধরনের একটা চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আমরা 'সীমান্ত' পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহী হই। আমাদের এই আগ্রহকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন আমাদের পুরনো কিছু কর্মী। ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশ ক'জন শিল্পী সাহিত্যিক চট্টগ্রামে চলে আসেন। এদের মধ্যে ছিলেন শওকত ওসমান, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, এবনে গোলাম নবী প্রমুখ। তাদের এবং চট্টগ্রামের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক ননী সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম 'প্রগতি লেখক সংঘের' সম্পাদক সুধাংশু সরকার ও কবি আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুভাশীষ চৌধুরী– যাকে আমরা 'বড়দা' বলে ডাকতাম– তাদের উৎসাহ এবং সহযোগিতায় 'সীমান্ত' প্রকাশনা শুরু করি। আমাদের একটা পারিবারিক প্রেস ছিল– ইম্পেরিয়াল প্রিন্টিং হাউজ নামে। পুরাতন গির্জা রোডে তখন একটা পানের বাজার ছিল। এই পানের বাজারের উল্টো দিকে ১৯৩৫ সালে প্রেসটি চালু করেন আমার মেজ মামা আহমদ সাগীর চৌধুরী। এই ইম্পেরিয়াল প্রিন্টিং হাউজ থেকে 'সীমান্ত' পত্রিকা ছাপানো হতো।

এই প্রেস সম্পর্কে আমার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে। আমি তখন ছোট, স্কুলে পড়ি। প্রেসের ওপর তলায় থাকি। এক রাতে প্রেস চলার ঘটাং ঘটাং শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে কৌতূহল জাগল– এত রাতে প্রেস চলার তো কথা নয়। কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে নিচে নেমে প্রেসে এসে দেখলাম কিছু সংখ্যক লোক মিটিং করছে। আর কী যেন ছাপা হচ্ছে। প্রেসের কম্পোজিটর, মেশিনম্যান এদের সঙ্গে ননী সেনগুপ্ত কী আলাপ করছেন। সেই প্রথম বলশেভইজম এবং কমিউনিজম– এই কথা দুটি শুনি। পরবর্তীকালে জেনেছিলাম প্রেসের কম্পোজিটর এবং মেশিনম্যান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'অভিযান' এই প্রেস থেকে ছাপা হতো গোপনে। 'অভিযান' পত্রিকার সম্পাদনায় ছিলেন ননী সেনগুপ্ত। আমাদের ইম্পেরিয়াল প্রিন্টিং হাউজের অনেক কর্মচারী এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

পত্রিকার জন্যে তো একটি দফতরের প্রয়োজন। আমার মামা আহমদ সাগীর চৌধুরীর একটি ব্যাংক ছিল– যেটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেউলিয়া হয়ে যায়। লালদীঘির পশ্চিম পাড়ে– এখন যেখানে গোপী ফার্মেসি তার পাশে ছিল ব্যাংক ভবন, তারই দোতলায় 'সীমান্ত' এর অফিস শুরু করি। আমি ও সুচরিত চৌধুরী 'সীমান্ত' এর যুগ্ম সম্পাদকের কাজে দায়িত্ব পালন করতাম প্রথম দিকে। তাই লেখা সংগ্রহের দায়িত্বও ছিল আমাদের দু'জনের ওপরে।

'সীমান্ত' এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল, আমার যতদূর মনে পড়ে তদানীন্তন মন্ত্রী সাহিত্যিক হবীবুলৱাহ বাহার, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, কথাশিল্পী মাহবুব-উল আলম, অন্নদাশঙ্কর রায়, কিরণ শংকর সেনগুপ্ত, সুভাশীষ চৌধুরী, এবনে গোলাম নবী, মুনীর চৌধুরী ও আমার একটা কবিতা 'স্বাধীনতা' লেখা নিয়ে।

যে দিন 'সীমান্ত' এর প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করা হয়, সে দিন কী কারণে আমি জানি না– চট্টগ্রামে উপস্থিত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি বিভূতি চৌধুরী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ছোট বোনের স্বামী। বিভূতি চৌধুরী প্রকাশনা উৎসবে সভাপতিত্ব করেছিলেন। প্রকাশনা উৎসবে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্মথ দাশ। সে সময় তিনি নামকরা রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী

ছিলেন। সুরেন রায় নামে একজন অংকন শিল্পী ছিলেন। এখন অনেকে হয়তো সুরেন রায়কে স্মরণ করতে পারবেন না। এই সুরেন রায় বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট দিকপাল যারা ছিলেন– যেমন বঙ্কিম চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম, মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ, তাদের প্রতিকৃতি এঁকে প্রকাশনা উৎসব কক্ষটিকে সুসজ্জিত করেছিলেন। 'সীমান্ত' প্রকাশনার পেছনে যাদের প্রচুর অবদান ছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গোপাল বিশ্বাস। এছাড়া আহমদুল কবীর (তিনি তখন চট্টগ্রামে ডেপুটি চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট ছিলেন), এস এ জামান (যিনি প্রখ্যাত আয়কর আইনজীবী), সয়ীদুল হাসান (মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বর্বর সেনারা হত্যা করে), এরা পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা এবং বিজ্ঞাপন জোগাড় করে না দিলে হয়তো 'সীমান্ত' প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

জলিল চৌধুরী, এলাহি বক্স অ্যান্ড কোং, হাশেমিয়া রেস্টুরেন্ট– তারা প্রায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিতেন।

'সীমান্ত' এর প্রথম সংখ্যা বাজারে আসার পর পরই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী– বিশেষ করে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা 'সীমান্ত'কে কমিউনিস্টদের মুখপত্র হিসেবে প্রচার করতে শুরু করে। এই অপপ্রচারে আমাদের বাড়িওয়ালা ভীত হয়ে 'সীমান্ত' অফিস স্থানান্তরের জন্যে নোটিশ দেন। এ সময় আর্য সঙ্গীত সমিতির অন্যতম বেহালা শিল্পী এবং প্রতিষ্ঠাতা বিধু ভূষণ বুদ্ধ মন্দির সড়কে অবস্থিত তার বাড়িটি ১৫ টাকা ভাড়ায় আমাদের দেন। যতদূর মনে পড়ছে ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি আমরা বুদ্ধ মন্দির সড়কে 'সীমান্ত'র অফিস স্থানান্তর করি।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, 'সীমান্ত' পত্রিকায় যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ছিল একথা তখন অস্বীকার করলেও এখন গর্বের সঙ্গে স্বীকার করি।

যে কোনো একটি মাসিক পত্রিকা চালাতে হলে তার জন্য একটা গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে হয়। এই রকম একটা গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছিল 'সীমান্ত'কে কেন্দ্র করে। তখন 'সাংস্কৃতিক বৈঠক' বলে একটা সংস্থা আমরা গঠন করি। এর কোনো নিয়ম কানুন ছিল না। প্রগতি গোষ্ঠী ও সাহিত্য সংঘ যখন সরকারের হামলায় ভেঙে গেল তখন সমস্ত প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকরা এই সাংস্কৃতিক বৈঠকে এসে জমায়েত হলেন। তখন এনায়েত বাজারে 'সাগীর মঞ্জিলের' সামনে একটা বেড়ার ঘর ছিল। সেই ঘরে খুরশীদ মহলের শ'খানেক পরিত্যক্ত চেয়ার ছিল। সেখানে প্রতি সপ্তাহে চট্টগ্রামের শিল্পী-সাহিত্যিকরা সমবেত হতেন– তাদের নিজেদের লেখা গল্প, কবিতা পাঠ করতেন। এই আসরে আহমদুল কবির, সানাউল হক, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, শওকত ওসমান প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত লেখক যোগ দিতেন।

তখন ইসলামের নাম দিয়ে এবং ইসলামের জিগির তুলে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তাধারা, উদারনৈতিক চিন্তাধারার পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছিল। একে প্রতিহত করতে হলে শুধু সংস্কৃতি সংঘ দিয়ে রোধ করা যায় না। একটা পূর্ণাঙ্গ সংগঠনের প্রয়োজন। কিন্তু তখন কোনো সংগঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল না।

আমার মামা আহমদ সাগীর চৌধুরী ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। চট্টগ্রামে সেই সময় মুসলিম লীগের দু'টি গ্রুপ ছিল। একটা আহমদ সাগীর গ্রুপ। অপরটি ফজলুল কাদের চৌধুরীর গ্রুপ। এই দুই গ্রুপের মধ্যে আহমদ সাগীর গ্রুপে বেশ কিছু ছাত্র কর্মী ছিল, যেমন মফিজুল ইসলাম, নূরুল ইসলাম চৌধুরী (পটিয়া), রুহুল আমিন নিজামী, শামসুল হক, ফজলুল হক (মীরেরসরাই বাড়ি যিনি বিএসসি নামে খ্যাত ছিলেন), চৌধুরী হারুনর রশিদ প্রমুখ। পরবর্তীতে তারা প্রায় সবাই প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন, কারণ তারা 'সীমান্ত' অফিসেই থাকতেন বেশিরভাগ। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের মূলনীতির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই মূলনীতিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কথা ছিল না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার কোনো স্বীকৃতি ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছিল। এর প্রতিবাদে এক বিরাট সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল লালদীঘির ময়দানে। তদানীন্তন রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের সম্পাদক মাহবুবুল হক এবং মোসলেম উদ্দিন ও শ্রমিকরা প্রগতিশীল আন্দোলনে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করছি। পাকিস্তানে প্রথম গণহত্যা সংঘটিত হয় চট্টগ্রামে হালদা নদীর কাছে মাদারসার টেকে। এই টেক কাটলে ওই অঞ্চলের কৃষকদের অনেক উপকার হয়। কিন্তু পাকিস্তানি সরকার কোনো মতেই সেই টেক কাটতে দেবে না। কৃষকরা জোর করে এই 'টেক' কাটতে গেলে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে কয়েকজন কৃষক নিহত হয়। এই হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের সমর্থকরা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। সে সময়ে বাঙালি-অবাঙালি বলে আমাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল না। সে সময়ে সি এ কালাম বলে এক মাদ্রাজি তরুণ ছাত্র সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে কাজ করতো (সি এ কালামের বড় ভাই ছিলেন তখন রেলওয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার)। মাহমুদুল হাসান নামে উর্দু লেখক সংঘের কর্মী এবং অন্যান্য সদস্যরাও আমাদের সঙ্গে কাজ করতেন। যখন বাংলা ভাষার দাবিতে মিছিল বের করতাম– তখন তারাও মিছিলে শরিক হতেন। এরপর এলো ৫০-এর দাঙ্গা। এই দাঙ্গা প্রতিরোধ করার জন্য আমরা চিন্তা করতে লাগলাম। সূর্য সেনের কর্মপন্থা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে ক্লাব সংগঠন করে কিছু তরুণকে আকৃষ্ট করা যায় এবং তাতে প্রতিরোধ আন্দোলন যথেষ্ট জোরদার হবে। সেই লক্ষ্যে মাদারবাড়ী ক্লাব, নন্দনকাননের শক্তি সংঘ প্রভৃতি ক্লাব গঠন করা হয়। এসব ক্লাব কর্মী ও আমাদের সমবেত চেষ্টায় সেই সময়ে জে এম সেন হল প্রাঙ্গণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সমাবেশের আয়োজন করে মানুষকে সচেতন করে তোলা হয়। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রফিউদ্দিন সিদ্দিকী। সমাবেশ শেষে দীর্ঘ একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী মিছিল বের করা হয়। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন রফিউদ্দিন সিদ্দিকী, আবদুল হক দোভাষ, প্রিন্সিপাল আবু হেনা, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, শওকত ওসমান, যোগেশ সিংহ

প্রমুখ। এই মিছিলের বৈশিষ্ট্য ছিল দু'হাজারেরও অধিক ক্লাব কর্মী ইউনিফর্মে সজ্জিত হয়ে ড্রাম বাজিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী গান গেয়ে গোটা শহর প্রদক্ষিণ করত। গানের নেতৃত্বে থাকতেন সাদেক নবী (প্রয়াত)।

প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ এবং সংস্কৃতি বৈঠকের সদস্যদের শক্তিতে সুসংহত করার লক্ষ্যে আমরা সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫১ সালের ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ মার্চ হরিখোলার মাঠে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন করি। এই সাংস্কৃতিক সম্মেলন করতে আমাদের প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল মহল এবং দৈনিক আজাদ পত্রিকা এমন বিরূপ প্রচারণা চালাতে লাগল যে, বেশিরভাগ শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের আমন্ত্রণে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে সাহসী হননি। এ বি এম হাবিবুলৱাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, অমিয় ভূষণ চক্রবর্তী, অজিত গুহ– তারা প্রায় সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তবে অমিয় ভূষণ চক্রবর্তী, কাজী মোতাহার হোসেন ও ড. এ বি এম হাবিবুলৱাহ লেখা পাঠিয়েছিলেন। ঢাকা থেকে এসেছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল।

হরিখোলার মাঠের এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সলিল চৌধুরীর নেতৃত্বে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একটি গানের দল অংশ নিয়েছিল। এছাড়া সুচিত্র মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, হেনা বর্মণ– এরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ– চিরঞ্জীব দাশ শর্মার নেতৃত্বে গণসঙ্গীত পরিবেশন করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তারপর কবিয়াল রমেশশীল ও ফণি বড়ুয়ার কবির লড়াই মুগ্ধ করেছিল সুধীজনদের।

দৈনিক পূর্বকোণ, চট্টগ্রাম, ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৯
[কবির সংগৃহীত কাগজপত্র থেকে প্রাপ্ত]

বাঙালির সংস্কৃতি ভাবনা

সংস্কৃতি বলতে সাধারণত আমরা বুঝি সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা, নৃত্য এবং জীবনাচরণ। সে কারণে আমরা গানের আসরকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলে অভিহিত করি। কিন্তু সংস্কৃতি বলতে বোঝায় মানুষের আচার-ব্যবহার, খাদ্যাভাস, বাস্তব ও মানসিক কীর্তি এবং কর্ম। তার জীবনযাত্রার আর্থিক সামাজিক রূপ, অনুষ্ঠান, উৎসব এমনকি ধর্মীয় প্রথা ও আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনা– যা মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। দুর্বলের সংস্কৃতি ধর্ম। আর সজ্জনের ধর্ম সংস্কৃতি।

ইংরেজি কালচার শব্দটির প্রভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে আমাদের ভাষায় এবং সাহিত্যে সংস্কৃতি ধারণাটি প্রচার ও প্রসার লাভ করে।

উনিশ শতকে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে দেশজ, ধর্মীয় এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের ফলে বাঙালি সংস্কৃতি অনেক সমৃদ্ধ এবং বিচিত্র রূপ লাভ করে। এই ধারাটি বহু চড়াই-উৎরাই পার হয়ে বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারায় পরিণত হয়। উনিশ এবং বিশ শতকে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘাত এত তীব্র হয়ে ওঠে যে, মুসলমানরা এই মূল সংস্কৃতি থেকে ক্ষিপ্রগতিতে সরে আসে। এই সরে আসার কারণ লিখতে গেলে লেখাটি দীর্ঘ হয়ে যাবে। আমি শুধু এই বিভেদের কারণটুকু সংক্ষিপ্তভাবে বিশেৱষণ করব।

ইংরেজ আগমনের পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এরূপ সংঘাতপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না। এই সেদিনও বাংলার মুসলমানরা হিন্দুদের মতো ধুতি, ফতুয়া, চাদর ব্যবহার করতেন। তাদের নামের আগে হিন্দু প্রতিবেশীর মতো 'শ্রী' শব্দ ব্যবহার করতেন। উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকেরা নামের আগে 'মুন্সি' শব্দটি ব্যবহার করতেন। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পাঁচ পীরের নামে, সত্য পীরের নামে, আল-বদর পীরের নামে দরগাহ এবং মন্দিরে শিন্নি দিতেন। তাদের অভাব এবং সমস্যার কথা মনে মনে চিন্তা করে মন্দির এবং দরগাহ্‌র নিকটস্থ গাছে মনোবাঞ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে লালতাগা বেঁধে দিতেন। বিপদসংকুল নদী পথে যাত্রার আগে সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য মানিক পীরের গান করতেন। উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহ উৎসবে কলাগাছ দিয়ে মঞ্চ তৈরি করতেন। সেখানে মঙ্গলঘট বসিয়ে তার ওপর ডাব এবং আম্রপাতা দিয়ে সুশোভিত করতেন। গায়ে হলুদ মেখে গান গেয়ে গেয়ে সাত পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করে বর এবং কনেকে গোসল করাতেন। বরকে গোসল করাবার দায়িত্ব ছিল নাপিতের ওপর। বিবাহ উৎসবে মেয়েরা 'হল্যা' গান করত, নৃত্য পরিবেশন করত। উভয় সম্প্রদায়ের উৎসবে রামায়ণ, মহাভারত, কথকতা, কীর্তন, পাঁচালি গান, কবির গান, যাত্রা, গম্ভীরা, বাউল, ঝুমুর গান, ভাসান গান, গাজীর গান, জারি গান এবং লাইলি মজনু, পদ্মাবতী, সোহরাব রুস্তম, আমীর হামজা, কারবালা প্রভৃতি পুঁথি সুর করে পাঠ করা হতো। মুসলমানদের মতো হিন্দুরাও হাতের পাতায় মেহেদী এবং পায়ে আলতা মাখত, রিঠা দিয়ে চুল শ্যাম্পু করত।

উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা মাথায় পাগড়ি কিংবা গামছা বাঁধতেন। খোলা মাথায় কেউ বাইরে যেতেন না। সম্প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ প্রতিবছর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গামছা বদল, পাগড়ি বদল হতো। রাখী বন্ধনও প্রচলিত ছিল।

মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদও ছিল প্রায় একই রকমের। তারা গঙ্গাজলী, মেঘডম্বুর, শাড়ি, চুড়িদার ইজার, লম্বা কোর্তা ও কাবাইসহ মাথার ওপর ওড়না পড়ত। উভয় সম্প্রদায়ের দরিদ্র ঘরের মেয়েরা তাঁতের তৈরি গামছা পরে বুকে কাঁচুলি বেঁধে গায়ে গামছা দিয়ে জীবন কাটাত। উভয় সম্প্রদায়ের অলঙ্কার সামগ্রীও ছিল একই ধরনের। পায়ের দশ আঙ্গুলে ঘুন্টি দেওয়া দশটি আংটি না হলে মেয়েদের চলতই না।

মাথায় সিঁথিপাঠ ও ফেচুয়া, গলায় হাসুলি, সাত নরিহার, মাধুলি ও স্বর্ণ মোহরের ছড়া, নাকে নথ, নাকফুল, নাকচাবি ও বোলাক; কানে কানফুল, ঝুমকা ও বলি; হাতে বাজুবন্ধ, তাড়, বাহু, পেচি, গাটিয়া, তাগা, তোড়ল ও খাড়ু; কোমরে চন্দ্রহার, সূর্যহার; পায়ে পাজব, নূপুর, মল, গোল খাড়ু প্রভৃতি অলঙ্কার পরতেন।

হিন্দুদের বিয়েতে মুসলমান মেয়েরা ঘটা করে পিঠা, পুলি, পাক্কন, বাতাসা নিয়ে পাল্‌কি চড়ে নাইওর যেতেন। তেমনি মুসলমানদের বিয়েতেও হিন্দু মেয়েরা অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে পিঠা, পুলি, পাক্কন, মিষ্টি, জিলাপি, বাতাসা নিয়ে নাইওর যেতেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারে এদের থাকা ও খাওয়ার জন্য মূলগৃহ সংলগ্ন আলাদা বাড়ি ছিল।

মোগল, রাজপুত এবং লোকজ সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছিল এই সংস্কৃতির ধারা। স্থাপত্যকর্মেও দেখা যায় মোগল এবং ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের বৈচিত্র্যময় সম্মিলন। আটচালা ঘর, গম্বুজ, মিনার প্রভৃতি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও জ্ঞানগুরু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একবার 'বাংলার বৈশিষ্ট্যের' কথা ওঠে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন : "আপনার মতে বাংলার বৈশিষ্ট্য কী?" রবীন্দ্রনাথ বললেন : "বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের যোগদৃষ্টি ও ঐক্যের যোগসাধনই বাংলার বিশেষ ধর্ম। আমার 'ভারতের ইতিহাসের ধারাতে' আমি একথা ভালো করেই বলেছি। এ দেশে উঁচু নীচু বহু ধর্ম ও সংস্কৃতিই পাশাপাশি রয়েছে। কেউ কাউকে নিঃশেষ করতে চায়নি। এইটি আর কোথায় কী দেখা যায়? আর সব দেশেই প্রবল ধর্ম ও সংস্কৃতি দুর্বলকে পিষে মেরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ভারতে কিন্তু সেটি কখনোই ঘটেনি। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সুরসঙ্গতির (ঐধৎসড়হু-র) সাধনাই হলো আমাদের বিশেষ সাধনা।"

সমাজ-গত রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ছাড়াও বাংলাদেশের উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকরা একই উৎপাদন যন্ত্র (লাঙল, ফলা, বলদ) দিয়ে চাষাবাদ করে। দুপুরে খাওয়ার জন্য নিজ নিজ বাড়ি থেকে পান্তা ভাত, পোড়া মরিচ পাঠানো হয়। ভালো তরকারি হলে তারা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভাগ করে নেয়। হুক্কা, ডাবায় উভয়ে ধূমপান করে। পরবর্তীকালের মতো এমন বাছ-বিচার ছিল না।

কামার, কুমার, তাঁতি, নাপিত, ধোপা, জেলে, ঢুলি, ঝাড়ুদার, কলু প্রভৃতি সম্প্রদায় গ্রামের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাত। প্রতিটি গ্রাম ছিল প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ। এ কারণেই বলা হতো গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, মাছভরা পুকুর ছিল বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের সম্পদ। তাদের অন্ন বস্ত্রের অভাব ছিল না। বারো মাসে তের পার্বণ, উৎসব আনন্দে বাঙালির জীবন কাটত। পহেলা বৈশাখ, হালখাতা, মাঘী পূর্ণিমা, চৈত্র সংক্রান্তি, নবান্ন, ঈদ, মহররম, পূজার আনন্দ, হোলি, রাসলীলা, দেওয়ালী, ভাইফোটা, রাখীবন্ধন, রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসবগুলোর মধ্যে কিছু কিছু উৎসবে ধর্মীয় ছাপ থাকলেও তা ছিল সৌভ্রাতৃত্বমূলক, অসাম্প্রদায়িক। এই উৎসবগুলোতে উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করে শুভেচ্ছা বিনিময় করত। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঋতু উৎসব প্রচলনের মধ্যদিয়ে বাঙালির এই উৎসবকে আরো বৈচিত্র্যময় করে তোলেন। উভয় সম্প্রদায় একত্রে এসব উৎসবে অংশগ্রহণ করত। এসব উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা বসতো। তাতে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে দু'পয়সা রোজগার করত।

সেই সমাজব্যবস্থায় দারিদ্র যে ছিল না তা নয়। মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষে বহুলোক মারা যেত। তখনো আধুনিক চিকিৎসার প্রবর্তন হয়নি। কবিরাজি, হাকিমী এবং মঘা শাস্ত্রীয় ওষুধ ছিল একমাত্র চিকিৎসা। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। গো-কোরবানি কিংবা মসজিদের সামনে বাদ্য-বাজনা নিয়ে কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা হতো না। যতটা হতো জমি দখল নিয়ে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে।

সুলতানি আমলে এবং আরাকান রাজসভায় মুসলমানরা সাহিত্য প্রতিভার যে স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তা আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে অসামান্য। তখন আলাওল, দৌলত কাজী এবং মাগন ঠাকুরের আবির্ভাব না হলে বাঙালি সাহিত্যের আধুনিক যুগের আবির্ভাব হতো কি না সন্দেহ। দেবভূমি থেকে বাংলা সাহিত্যকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিলেন তারা। সাহিত্যে মানবতার আমদানিও তারা করেছিলেন।

যে জন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী,
সে জন কাহার জন্ম নির্ণয় ন' জানি।

আবদুল হাকিমের এই চরণ দুটিতে বাংলা ভাষা বিরোধীদের প্রতি কবির যে ক্ষোভ ফুটে উঠেছে তা লক্ষণীয়। এদের তিনি বেজন্মা বলতে দ্বিধাবোধ করেননি।

কিংবা

নানা বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগত ভ্রমিয়া দেখি
একই মায়ের পুত।

মানবতার জয়গানে ভরপুর এই কবিতাটি চণ্ডিদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'-এর সমসাময়িককালে লেখা। পুঁথি, গাঁথা, পালা, গীতি-নকশা পড়লে অনায়াসে বুঝা যায় এতে হিন্দু কি মুসলমানের পৃথক কোনো ছাপ ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পরাগল খাঁর আশ্রিত কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং ছুটি খাঁর প্রিয় কবি শ্রীকরণ নন্দীও এই ভাষাকে হিন্দু-মুসলমানের নিজ ভাষা নাম দিয়েছিলেন। ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের ভাষায়– "সেকালে গোঁড়া মোলব্বা ও টুলো পণ্ডিত একদিকে আরবি ফারসি ও অপরদিকে সংস্কৃত শব্দের মাল-মস্‌লা ঢুকাইয়া বাঙ্গালা ভাষার কেলব্বা দখল করিতে প্রয়াস পান নাই। পূর্ববঙ্গ গীতিকার (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) 'মাণিকতারা' নামক পালায় জামাইৎ উলব্বা যে অপূর্ব কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সমকক্ষতা দাবি করিতে পারে, এইরূপ হিন্দু কবির সংখ্যা অতি অল্প। এই পুস্তকে লেখকদ্বয় (আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও ড. মুহম্মদ এনামুল হক) কবি দৌলত কাজীর (১৬২২-১৬৩৮ খ্রিঃ আবির্ভাব কাল) 'সতী ময়না' নামক কাব্যের যে অপূর্ব কবিত্ব-সম্পদের কথা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বাঙালি মাত্রেই বুঝিবেন যে, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির কৃতিত্ব ও গৌরব যতটা হিন্দুর ততটা মুসলমানের। ইহাদের এক সম্প্রদায় যদি তাঁহাদের স্বীয় সৃষ্ট কীর্তি হইতে কোনো অজুহাতে সরিয়া দাঁড়ান, তবে তাঁহারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাঁহাদের পূর্ব পুরুষের অমূল্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইবেন মাত্র।

হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয় ইংরেজ আগমনের পরে। প্রথমদিকে ইংরেজরা সদ্য রাজ্যহারা মুসলমানদের বিশ্বাস করত না। সমস্ত উচ্চপদ দেওয়ানি, খাজাঞ্চি, দালাল, ফড়িয়া জাতীয় পেশায় নিযুক্ত হয় হিন্দুরা। এই পেশায় নিয়োজিত থেকে তারা প্রচুর পরিমাণ অর্থের অধিকারী হয়। এই অর্থ দিয়ে তারা প্রথমে জমিদারি কেনে এবং মহাজন হয়ে গ্রামে সুদে উচ্চহারে টাকা লগ্নি করে। এতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ের গরিব চাষী প্রজারা শোষিত হতে থাকে। যেহেতু দরিদ্র কৃষক, প্রজা এবং ক্ষেত মজুরদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান, সেহেতু হিন্দুদের প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ গড়ে ওঠে।

ইংরেজরা এ দেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলন করে, মোলব্বা মৌলভীদের প্ররোচনায় এবং মুসলিম আশরাফ শ্রেণীর নির্দেশক্রমে মুসলমানরা সেই শিক্ষা গ্রহণ করেনি। ফলে শিক্ষা-দীক্ষা, পেশায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে তারা প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ে। এই পাশ্চাত্য শিক্ষাকে অনেকে কেরানি তৈরির শিক্ষা বললেও এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল আধুনিক ইউরোপের রেনেসাঁসের ফসল। আমাদের অতীত শিক্ষাব্যবস্থার চেয়ে অনেক উন্নত। যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক এবং উদার মানবিক চিন্তায় সমৃদ্ধ। এই শিক্ষা প্রচলনের প্রায় অর্ধশতাব্দী পর নবাব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আমীর আলী, স্যার সৈয়দ আমহদ, এ কে গজনবী এবং এ কে ফজলুল হকের প্রেরণায় এবং চেষ্টায় মুসলমানরা ধীরে ধীরে এই শিক্ষা গ্রহণ করার দিকে অগ্রসর হয়। বিকাশ হয় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। শিক্ষা শেষে তারা দেখে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা সরকারি এবং অন্য কোনো জায়গায়

তাদের জন্য চাকরি বরাদ্দ নেই। অগ্রগামী হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা পেরে উঠছে না। ফলে হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি তারা বিরূপ হয়ে ওঠে। আর এই বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় ইন্ধন যোগায় ইংরেজরা। কারণ তখন হিন্দুরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে।

সাহিত্য ক্ষেত্রে যে বিতর্কের সূচনা হয়, তাতে বাংলা সাহিত্য দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত শ্রেণীর উস্কানিতে ফরাসি শব্দসমৃদ্ধ ইসলামি এবং সংস্কৃত শব্দসমৃদ্ধ হিন্দু সাহিত্য অভিধায় পরিণত হয়। এই বিতর্ক চলে দীর্ঘদিন। এরই এক পর্যায়ে পাকিস্তানের তমসায় আচ্ছন্ন মুসলমানরা বাংলা সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতি এবং রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু কবি বলে আখ্যায়িত করে। পঞ্চ প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করাকে তারা কুফরি আখ্যা দেয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ধর্মীয় উন্মাদনায় আমাদের সংস্কৃতির যা কিছু ভালো, যা কিছু মঙ্গলময় এবং যা কিছু প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলনমূলক তা জোর করে বন্ধ করে দেয়ার প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু তাদের সমস্ত বাধা নির্যাতন উপেক্ষা করে আমরা বহু বছর ধরে এসব উৎসব পালনের চেষ্টা করে আসছি।

পাকিস্তান আমলে পহেলা বৈশাখের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবকেও তারা হিন্দুদের উৎসব বলে চিহ্নিত করেছিল। পহেলা বৈশাখ বাঙালির একটি সার্বজনীন লোকজ উৎসব। এদিন আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেয়া হয় নতুন বছরকে। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হলো নববর্ষ। এক সময় নববর্ষ পালিত হতো ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে। তখন এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কৃষির। কারণ কৃষিকাজ ছিল বিশেষ ঋতুনির্ভর। এই কৃষিকাজের সুবিধার্থে মোগল সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০-১১ মার্চ বাংলা সন প্রবর্তন করেন। এবং তা কার্যকর করেন তার সিংহাসন আরোহণের সময় থেকে। অতীতে বাংলা নববর্ষের মূল উৎসব ছিল হালখাতা। এটি পুরোপুরি একটি অর্থনৈতিক ব্যাপার। গ্রামে-গঞ্জে-নগরে ব্যবসায়ীরা পহেলা বৈশাখে তাদের পুরনো হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করে হিসাবের নতুন খাতা খুলতেন। এ উপলক্ষে তারা খরিদ্দারদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি বিতরণ করতেন। এই অনুষ্ঠানটি এখনো পালিত হয়।

গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিন তারা বাড়িঘর পরিষ্কার রাখে। পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে আমপাতার মালা গেঁথে তা দিয়ে বাড়ি সাজায়। ব্যবহার্য সামগ্রী ধোয়ামোছা করে এবং ভোরে স্নান সেরে পূত-পবিত্র হয়। এ দিনটিতে ভালো খাওয়া, ভালো থাকা এবং ভালো কাপড় পরাকে মঙ্গলজনক বলে বাঙালিরা মনে করে। প্রত্যেক বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের আগমন ঘটে। মিষ্টি, মিঠা, পায়েসসহ নানা রকম লোকজ খাবার তৈরির ধুম পড়ে যায়। একে অপরের সঙ্গে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় চলে।

বাংলাদেশে বড় আকারে পহেলা বৈশাখ পালন শুরু হয় ছায়ানটের উদ্যোগে ১৯৬৫ সালে। বাঙালি সংস্কৃতির হারানো উৎসবগুলোকে ফিরিয়ে আনার এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার এই উদ্যোগ বর্তমানে একটি মহা উৎসবে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে নগর জীবনে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে নববর্ষ পালিত হয়। বর্ষবরণের চমকপ্রদ জমজমাট আয়োজন ঘটে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায়। এখানে বৈশাখী উৎসবের অনুষ্ঠানমালা এক মিলনমেলার সৃষ্টি করে। নববর্ষের প্রথম প্রভাতে রমনা উদ্যান এবং এর চারপাশের এলাকায় প্রবল জনস্রোতে সৃষ্টি হয় জাতীয় বন্ধন। ছায়ানটের উদ্যোগে জনাকীর্ণ রমনার বটমূলে রবীন্দ্রনাথের আগমনী গান 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো'-এর মাধ্যমে নতুন বর্ষকে বরণ করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সবার হৃদয়ের উৎস হতে জাতীয় সঙ্গীতের বিস্ফোরণ ঘটে। তাতে বাঙালি মাত্রই কণ্ঠ মিলায়– আমার সোনার বাংলা / আমি তোমায় ভালোবাসি। এখন বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ ছাড়াও পালন করা হয় ঈদ, মহররম, পূজা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বসন্ত উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তি, নবান্ন উৎসব, পৌষমেলা, রাসলীলা, দেওয়ালি, ভাইফোটা, রাখী বন্ধন, রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসবও প্রচলিত। এসব উৎসবকে হিন্দুয়ানি বলে আখ্যা দেয়ার লোক যে এখনো নেই তা নয়, তবে বেশিরভাগ মানুষ একে জাতীয় উৎসব হিসেবে মেনে নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা সংগ্রাম করে অর্জন করেছি এবং এই উৎসবগুলোকেও প্রতিষ্ঠিত করেছি বহু সংগ্রামের মধ্যদিয়ে, তাই আমাদের দেশের এই উৎসবগুলো সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, সৌভ্রাতৃত্বমূলক। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকে না। সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল শ্রেণীর মানুষ এতে সাড়া দেয়। তাই দিন দিন এই উৎসবগুলো হয়ে উঠছে আমাদের প্রাণের উৎসব, আমাদের আত্মপরিচয়ের উৎসব, বাঙালির উৎসব এবং দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়ার উৎসব।

দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৪ এপ্রিল ২০০৭

তাই পবিত্র যা একান্ত ব্যক্তিগত

কয়েক মাস আগে আমার জীবনে যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছে, তার মূল্যের পরিমাপ করা খুবই কঠিন। আমি কবি, আমি লেখক। অন্য কবি-লেখকদের চেয়ে আমার জীবনের মাত্রা ভিন্নতর। আমি কবিতা লিখি বলে কবি নই। আমি কবিতায় চিরকাল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছি। কখনো হাত ভেঙেছে, পা ভেঙেছে, মাথা রক্তাক্ত হয়েছে। কিন্তু কোনোদিন হাল ছাড়িনি। আমি রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যকে একই মেল-বন্ধনে মিলিয়েছি আমার জীবনে। কাজেই আমার কবিতা আমার রাজনৈতিক চেতনাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। এই চেতনা নিরন্নের অন্ন পাওয়ার সংগ্রামকে তীব্র করে তোলে। এই চেতনা– যারা ক্ষমতাবান, বিশ্বজুড়ে ক্ষমতার দাপটে মানুষকে হেয় জ্ঞান করে অসহিষ্ণু হিটলার ও বুশের মতো উগ্র আস্ফালনে মানুষের জীবনের শান্তি ও স্বস্তি কেড়ে নেয়, যুদ্ধ চালিয়ে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ওপর অমানবিক আঘাত করে, তখন আমি স্থির থাকতে পারি না। তাদের সঙ্গে আমি কোনোদিন আপস করিনি। আমার হতাশা এবং যন্ত্রণা যখন অন্তহীন বেদনায় ডুবতে বসে আমি চোখের জলে তার সমাধান খুঁজি না। আমি নিজের মতো করে তার মোকাবেলা করি। আমার জীবনের বড় ব্যাপ্তির মধ্যে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আমার চেতনা কখনো ওপরে উঠেছে, কখনো নিচে নেমেছে। কিন্তু সত্য অনুসন্ধানে আমি কোনোদিন ক্লান্তি অনুভব করিনি। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অশুভ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করিনি।

এই দ্বন্দ্বের সূচনা হয় গত ১৮ জুন ২০০৭ তারিখে আমার দেয়া একটি বিবৃতিকে উপলক্ষ করে। বিবৃতিটি ছিল শেখ হাসিনাকে নিয়ে। সেখানে আমি বলেছি– 'আমাদের প্রচলিত রীতি ও সামাজিক মূল্যবোধ অনুযায়ী প্রসূতি সন্তান জন্মদানের সময় মায়ের উপস্থিতি অপরিহার্য। আমার বাংলার ঐতিহ্য ও মানবিক কারণে শেখ হাসিনাকে তার কন্যার পাশে যাওয়ার সুযোগ প্রদানের জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।' বিবৃতিতে প্রথম নাম আমার। অন্য বিবৃতিদাতাদের নাম– সৈয়দ শামসুল হক, রামেন্দু মজুমদার, আলী যাকের, বেলাল চৌধুরী, মহাদেব সাহা, নাসির উদ্দিন ইউসুফ, মুনতাসির মামুন, ফেরদৌসী মজুমদার, আনোয়ারা সৈয়দ হক, হাশেম খান, গোলাম কুদ্দুছ, ফেরদৌসী প্রিয়ভাসিনী, ড. মুহাম্মদ সামাদ।

এ বিবৃতি প্রদানের পর কিছু লোক আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে এ ধরনের বিবৃতি না দেয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ জানায়। বলে, এতে আমার বিপদ হতে পারে।

এ বিবৃতির মধ্যে আমি অন্যায় কিছু দেখি না। জরুরি অবস্থা বলে কি মানবতার কথাও বলা যাবে না? নিজের বিবেককে টুটি চেপে হত্যা করতে হবে? তাহলে তো আমি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবো। দেশে কি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি বিরাজ করছে? হাসিনার দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ার আগেই কি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ঘৃণায় তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবো? যে সরকারকে তাদের সুকীর্তির জন্য সমর্থন দিয়ে আসছি, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে তাদের কাছ থেকে এতটুকু ন্যায়বিচার আশা করতে পারি না? মানুষ মানবতার কারণে শত্রুকেও সহানুভূতি জানায়। হাসিনার প্রতি এরকম সহানুভূতি জানানো কি অন্যায়?

উলেৰখ্য, আমি এই সরকারকে বিধাতার আসনে বসাইনি কখনো। তাদের ভালো কাজের জন্য সমর্থন দিয়েছি। একমাত্র বিধাতার কর্মই ত্রুটিহীন বলে বিবেচিত হয়। এরা যা করছেন তার সবটাই যে সমর্থনযোগ্য তা নয়। তারা যা করছেন তাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এটাকেও মেনে নেই এজন্য যে বড় কিছু করতে গেলে কিছু ছোট ছোট ত্রুটি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে শেক্সপিয়রের নাটক 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর একটি সংলাপ মনে পড়ে –

To do a great right
Do a little wrong
And curb the devil of his will

হাসিনার রাজনীতির সঙ্গে আমি একাত্ম নই। তার রাজনীতি আমাদের মূলধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করে আমি অগতির গতি হিসেবে তাদের রাজনৈতিক ধারাকে মাঝে মাঝে সমর্থন দিয়ে থাকি। নিঃশর্ত সমর্থন নয়। সে যখন ভোটের আশায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে বিসর্জন দিয়ে একটি কট্টর ইসলামিক দলের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করেছি। তার রাজনৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অপরিণামদর্শী বক্তব্যের সব সময় কঠোর সমালোচনা করেছি। বলেছি, তিনি আমাদের সমর্থন চান, কিন্তু পরামর্শ চান না। গত ৭ মে ২০০৭ তারিখে হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ওপর আমি জনকণ্ঠে 'সাহসী জননীর কাছে বুড়ো সন্তানের আকিঞ্চন' শিরোনামের কলামে লিখি :

'মা, রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার জনগণ বৈরী পরিবেশে তোমাকে যে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, আমি জানি তা তোমার অন্তর স্পর্শ করেছে। ক্ষমতায় গেলে এর বিনিময়ে দেশবাসীকে তুমি কী উপহার দেবে? দেশবাসী তোমার কাছে সব পেয়েছির দেশ আশা করে না। আশা করে সুখী সমৃদ্ধশালী দুর্নীতিমুক্ত একটি দেশ। আশা করে অতীতে যে ভুল-ভ্রান্তির কারণে আওয়ামী লীগ ২০০১ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারেনি (নির্বাচনের কারচুপির পরও ক্ষমতায় আসত) সেই ভুল-ভ্রান্তিগুলো সংশোধনের জন্য এবার যেন তুমি শক্ত হাতে আওয়ামী লীগের হাল ধরো। দুর্নীতি পরায়ণ এবং সন্ত্রাসী বলে পরিচিত যেসব ব্যক্তি তোমাকে ঘিরে রাখে তাদের দল থেকে বের করে দেয়ার সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করো।'

এই লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর আমার অনেক প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব হাসিনাকে কেন সাহসী জননী বলেছি, তার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাদের ক্ষোভকে আমি গ্রাহ্য করিনি। আমি ভেবেছি, এ রকম আবেদনের মধ্যদিয়ে যদি আওয়ামী

লীগের একক নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটানো যায় এবং যে সমস্ত দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তি ও সন্ত্রাসী শেখ হাসিনাকে ঘিরে রাখে তার থেকে যদি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে মুক্ত করা যায়, তাহলে অসাম্প্রদায়িক, বাঙালি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের বৃহত্তম দল আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসমুক্ত হয়ে দুর্নীতিবাজদের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের যে সমস্ত নেতা গ্রেফতার হয়েছেন, পত্রিকায় তাদের স্বীকারোক্তি পড়ে আমার ক্ষোভের মাত্রা বেড়ে যায়। এই স্বীকারোক্তি জোরপূর্বক নেয়া হয়েছে, না তারা সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু তার মধ্য থেকে যে সমস্ত দুর্নীতির ঘটনা বেরিয়ে এসেছে তা দীর্ঘদিন লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেরিয়েছে। এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু সবটাই যে মিথ্যা নয়, তা কারো বোধের অগম্য থাকেনি। সে কারণে ৪ জুন, ২০০৭ তারিখে জনকণ্ঠে 'আলোর সন্ধানে দেশ : সৎ মানুষের খোঁজে দেশ' শিরোনামের কলামে লিখেছিলাম– 'এই পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটাবার বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতার মঞ্চে অধিষ্ঠিত। আমি আমার আগের লেখায় বার বারই বলেছি, এখনই সময় সমাজে রূপান্তর ঘটাবার। কিন্তু সেই রূপান্তর ঘটানোর একপর্যায়ে যখন দেখি ডান-বাম-মধ্যপন্থী গ্রেফতারকৃত রাজনৈতিক নেতাদের দুষ্কর্ম ও দুর্নীতির খতিয়ান, তখন হতাশ হয়ে পড়ি। যাদের ভাবতাম মূলধারার রাজনীতিবিদ হিসেবে, মূলধারার রাজনীতির উত্তরাধিকারী বলে তাদের দুর্নীতির বিস্তৃতি দেখে আফসোস হয় এতদিন কিভাবে তাদের সমর্থন দিয়েছি। মূলধারার রাজনীতি সততার রাজনীতি। মূলধারার রাজনীতি আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার রাজনীতি। মূলধারার ঐতিহ্য ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই চেতনা আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে ঠেলে দেয়। এই চেতনা আমাদের সৎ বাঙালি হতে শেখায়। সৎ মানুষ হতে শেখায়। এই চেতনা আমাদের গণতান্ত্রিক বোধকে সমৃদ্ধ করে। আর সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রেরণা দেয়। ধর্মান্ধতার কবল থেকে আমাদের মুক্ত করে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মুক্তচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে।

এ চেতনার সঙ্গে কোনোভাবে দুর্নীতি পাশাপাশি চলতে পারে না। এই চেতনা সব সময় মানুষের অন্তর্নিহিত সততাকে উজ্জীবিত করে। গণতন্ত্রকে রাহুমুক্ত করতে শেখায়। অথচ গ্রেফতারকৃত রাজনৈতিক নেতাদের মুখ থেকে যে সমস্ত স্বীকারোক্তি পত্র-পত্রিকায় দেখেছি, এই স্বীকারোক্তি কি জোরপূর্বক নেয়া হয়েছে, না তারা বিবেকের তাড়নায় দিয়েছে– এতে সংশয় প্রকাশ করলেও, মনে হয় এরা দীর্ঘকাল ধরে কী জনসাধারণের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছেন? এতদিন ধরে তারা যা করেছেন তা রাজনীতি, না রাজনীতি নিয়ে বাণিজ্য? এরা দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেনি দীর্ঘকাল। এ সম্পর্কেও সংশয় জাগে। এরা নির্বাচনে ওইসব ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয়, যারা দুর্নীতির জন্য এবং শ্রেয়বোধের অভাবে সামাজিকভাবে ঘৃণ্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েও পেশীশক্তি এবং কালো টাকার জোরে নির্বাচিত হয়ে আসে। এরা সৎ এবং মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মনোনয়ন না দিয়ে মনোয়ন দেয় কালো টাকা এবং পেশীশক্তির গডফাদারদের। এরা পার্টি ফান্ডের নামে কোটি কোটি টাকা চাঁদা আদায় করে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করে থাকেন।'

আমি আওয়ামী লীগ করি না, বিএনপির তো কথাই ওঠে না। যে দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে দীর্ঘকাল মনুষ্যত্বের স্বর্গ রচনায় কাজ করেছি, লড়াই করেছি, স্বপ্ন দেখেছি, সেই দলের আদর্শের ভগ্নাংশও আজ দেখি না। এই সর্বনাশা বিলুপ্তি আমাকে কাতর করলেও তা ইতিহাসের সৃষ্টি হিসেবে মেনে নিয়েছি। সেই আদর্শের ছিটেফোটা নিয়ে যে কিছু বামপন্থী ছোট দল এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে অতীতের সেই তেজ, বীর্য, মানবসত্তার চিরজাগ্রত শাশ্বত বোধ দেখতে পাই না। সমাজ বদলের অঙ্গীকারের কথা তারা বলে থাকলেও তাদের কাজেকর্মে জীবনাচরণে পরাজয়কে অস্বীকার করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ়তা খুঁজে পাই না।

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। বহু সংকট পেরিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়েছি। সংকটে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে, রক্তস্রোতে ভেসে মুক্তির সংগ্রামে আমরা চারটি শব্দ চয়ন করেছি। গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র-এর মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পেয়েছিলাম। সুখ-দুঃখ বেদনার অভিঘাত সহ্য করে আমরা স্বাধীনতার অনির্বাণ শিখায় আলোকিত হয়েছিলাম। আমাদের সংবিধানে ফুটে উঠেছিল তারই বিপুল ঐশ্বর্য।

বলা বাহুল্য, বঙ্গবন্ধুই এই ঐশ্বর্যের ফুল ফোটানোর মালী। এই কারণে একজন সচেতন লেখক হিসেবে আমি বঙ্গবন্ধুর নিকটবর্তী হয়েছিলাম।

সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে মনুষ্যত্বের স্বর্গ রচনাই কবির কাজ। তাই সারাজীবন সবাইকে নিয়ে সুস্থ সুন্দর আনন্দময় জীবনের পথ খুঁজেছি। যে দেশটির প্রতি তাকিয়ে জীবনে এই আদর্শবোধকে প্রশ্রয় দিয়েছি সেই দেশটি আর নেই। যেখান থেকে পেতাম সংকটকালে অভয় মন্ত্রের প্রেরণা। সেই উৎসও শুকিয়ে গেছে।

মানুষের সবচেয়ে বড় বেদনা স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। তাই জীবনের গভীরে রাজনীতির ক্ষেত্রে যখন অমার্জনীয় ব্যর্থতার ছবি দেখি তখন সংকটের মুখোমুখি হওয়ার সাহস পাই না। মুক্তি সংগ্রামে প্রস্তুতি পর্বের মতো যখন আওয়ামী লীগকে আর দেখি না এবং সম্প্রতি এর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছে তা প্রত্যক্ষ করি, তখন মনে হয়, এই অবক্ষয় আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাডেজির সংকটের মুখোমুখি হয়ে যখন আমার হৃদয়ে আত্মগ্রাসী সুর বাজে তখন বিপন্ন বোধ করি।

এই বিপন্নতার মধ্যেও স্মৃতিকথা লিখি, কলাম লিখি, কবিতা লিখি, প্রবন্ধ লিখি। কিন্তু তা কখনো কখনো মানুষের হৃদয় স্পর্শ করলেও আমি নিজে তৃপ্তি পাই না। কোথায় যেন কেউ আমার স্বাধীনতা হরণ করেছে মনে হয়। এই সংকটের সহজ সরল সমাধান হাতের কাছে পাই না।

বর্তমান সরকার যে রাজনৈতিক জঞ্জাল দূর করার কথা বলেছেন, তাতে আশান্বিত হয়ে তাদের সমর্থন দিয়েছিলাম। এরা অন্ধকার দূর করে জ্ঞানভিত্তিক, ঐতিহ্যমণ্ডিত এবং স্বাধীনতার চেতনায় আলোকিত একটি গণতান্ত্রিক দেশ যদি উপহার দিতে পারেন তাহলে তারা ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে থাকবেন। সম্প্রতি দেশব্যাপী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এটা একটা ন্যায়সঙ্গত দাবি। অতীতের সরকারগুলো এ বিচারকার্য সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ এবং সেনা প্রধান মইন উ আহমদ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ন্যায্যতা স্বীকার করেছেন। আশা করি, এ দাবি কার্যকর করতে তারা দ্বিধান্বিত হবেন না। রাষ্ট্রের বুকে এত বড় একটা দুষ্ট ক্ষত রেখে তারা যে জ্ঞানভিত্তিক মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক সোনার বাংলা রচনার অঙ্গীকার করেছেন তা ব্যাহত হবে। তারা যে সমস্ত সংস্কারমূলক কাজ হাতে নিয়েছেন, তাতে যদি ব্যর্থ হন– আমরা, যারা এই সরকারকে সমর্থন দিয়েছি তাদের ভরসার জায়গাগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ইদানীং কোনো কোনো কাজের জন্য তারা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছেন দেখে শংকিত বোধ করি। তাদের বক্তব্যের সমন্বয়হীনতাই এর জন্য দায়ী বলে মনে হয়।

বর্তমানে আমার ব্যক্তি জীবনে রাজনীতি এবং স্বদেশ ভাবনায় বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। মনে হচ্ছে আমি একটি বৃত্তের মধ্যে বন্দি হয়ে আছি। এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। যারা সন্ধ্যাবেলায় আমার কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা এবং প্রবন্ধের উচ্চকিত সুর শুনে বিমুগ্ধ হন আবার বলেন, এক সময় আমার রাজনীতির জন্য তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এই বৃদ্ধ বয়সে আর কোনো বিপদের তারা মুখোমুখি হতে চান না। তখন আশ্রয়ের জায়গা খুঁজে পাই না।

রাষ্ট্র ও সমাজ যখন দুর্বলকে অত্যাচার করে সবলের আত্মপ্রতিষ্ঠার সহজ পথ বেছে নেয়, তখন গভীর অমানিশা গ্রাস করে আমার চিত্তকে। বুঝি, মানুষের আত্মপরিচয় বহু বিচিত্র, বহুমাত্রিক, নানাভাবে খণ্ডিত। কখনো গ্রীষ্মের খরতাপ, কখনো শ্রাবণের অঝোর বৃষ্টি, কখনো হেমন্তের ঢেউতোলা শস্যক্ষেত, শরতের কাশফুল আর বসন্তের নানা রঙের ফুল ফোটা। একেক সময় তার একেক রূপ। ভোর আলোয় ভরা। দুপুর রৌদ্রদগ্ধ। রাত্রি গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। অনেকটা ঋতু বদলের মতো। সপ্তবর্ণকেও ছাড়িয়ে যায়। যারা সেবা-শুশ্রূষা, আদর-যত্ন এবং ভালোবাসা দিয়ে আমাকে চিরজীবী করতে চান, তারাই আবার যখন আমাকে কাজের মধ্যদিয়ে আমার চিরজীবী হওয়ার বাসনাকে বাধা দেন তখন আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত হয়। তারাই আবার আমার সব কর্মকে জীবিত রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। বোধ করি ভালোবাসার ধর্মই এরূপ, অকারণে অনিষ্ট আশংকা করে। রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং লেখালেখির জন্য আমার ওপর আর কোনো নির্যাতন হোক এটা তারা কোনমতে সহ্য করতে পারবেনা।

মানবজীবনের এই এক গোলক ধাঁধা। এই গোলক ধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে সৃষ্টিশীল চিন্তাকর্ম দিয়ে নিজেকে ফুলের সৌরভের মতো জড়িয়ে রাখার স্বপ্ন সফল হয় না। জানি, জীবনটা মসৃণ নয়। জীবনের স্রোত সরলরেখায় প্রবাহিত হয় না। আঁকাবাঁকা হয়ে পথ কাটে। কিন্তু এই স্রোত যখন প্রবল হয়ে বন্যায় মানুষের ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নেয় সেই স্রোতের কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হয়। একে বাধা দেয়া মানে স্রোতের প্রবলতাকে আরো বাড়িয়ে তোলা। এ সময় স্রোতে ভেসে থাকা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে গেলে নির্ঘাত মৃত্যু।

স্বদেশকে খোঁজাই কবির বড় কাজ। নিজের কাছে যাওয়ার জন্য আমি এখন স্বদেশকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আইনস্টাইনের সহযোগী জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন বোস এক সময় 'বিশ্বভারতী'র উপাচার্য ছিলেন। বিদায়বেলায় বলেছিলেন– আমি উপাচার্য থাকাকালে হাতে লণ্ঠন নিয়ে শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজেছি। তাঁকে খুঁজে পাইনি। এও তেমনি। আমি আমার স্বপ্নের স্বদেশকে খুঁজে পাচ্ছি না।

দৈনিক যুগান্তর, ৮ ডিসেম্বর ২০০৭

সমস্ত অর্জন আজ মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে

আমি ১৯২৭ সালের ৭ নভেম্বর চট্টগ্রামের রাউজান থানার গহিরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। ১৯৩০ সালে আমি মাকে হারাই। তখন আমার বয়স মাত্র ৩ কি ৪ বছর। আমার জন্ম সাল নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি আছে। আমার নানার মতে ১৯২৬ আর আমার জেঠার মতে ১৯২৭ সাল। আমি মাকে হারিয়ে গ্রামে আমার নানী এবং জেঠাইমার কাছে বড় হয়েছি। ১৯৩৫ সালের শেষের দিকে চট্টগ্রাম শহরে আসার আগে আমি গহিরা স্কুলে লেখাপড়া করেছি। তখন গহিরা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন বিলেত ফেরত গুরুদাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সাদা খদ্দরের পায়জামা, খদ্দরের পাঞ্জাবি এবং খদ্দরের ধুতি পরতেন। আমাদের সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে 'হও ধরমেতে ধীর; হও করমেতে বীর', গানটি প্রতিদিন করাতেন। অকৃতদার এই হেড মাস্টার অজগ্রামে তাঁর ছোটবোন কমলাকে নিয়ে এসেছিলেন নারীশিক্ষা প্রবর্তনের ইচ্ছা নিয়ে।

গহিরা স্কুল স্থাপন করেছিলেন আমার নানা এবং মামারা। গ্রামের রক্ষণশীল তথা সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা গ্রামে শিক্ষা বিস্তার হোক– এটা চাইতেন না। ফলে নারী শিক্ষা তো দূরে থাকুক, সাধারণ শিক্ষাও বাধার মুখোমুখি হতো। গ্রামের বেশির ভাগ লোক ছিল গরিব, প্রায় অসহায়। আমার মামাদের উদ্যোগে স্কুলটি হয়ে উঠেছিল গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। প্রথম প্রথম সম্ভ্রান্ত বংশের কেউ তাদের ছেলেদের গ্রামের স্কুলে ভর্তি করাত না। কারণ স্কুলটি দরিদ্র সন্তানদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। গুরুদাশ বাবুর পরিচালনায় স্কুলটি উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল।

একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটে, যার ফলে গুরুদাশ বাবু স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। গ্রামে সম্ভ্রান্ত বংশীয় এক দারোগা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বদলি হয়েছিলেন। যে স্থানে বদলি হয়েছিলেন, সেই স্থানে তার দু'ছেলেকে ভর্তি করতে না পারায় গহিরা স্কুলে ভর্তি করিয়ে ছিলেন। তারা স্কুলে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে আসত। গ্রামে গরিব ছাত্রদের পরিষ্কার জামা বা কাপড় পরার সামর্থ্য ছিল না। একদিন এই দুই ভদ্র সন্তানের পাশে তাদের গোলামের ছেলে বসেছিল ময়লা জামা কাপড় পরে। দারোগা সাহেবের এই দুই ছেলে এতে রাগান্বিত হয়ে ওই দরিদ্র ছেলেকে লাথি ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। গুরুদাশ বাবু কোনোদিন স্কুলে বেত ব্যবহার করতেন না। অন্য শিক্ষকরাও যাতে স্কুলে বেত ব্যবহার না করেন সেই ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। কিন্তু দারোগা সাহেবের এই দুইছেলের আচরণে তিনি এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, এই ছেলে দুটিকে তাঁর রবমে নিয়ে গিয়ে বেত দিয়ে পিটিয়েছিলেন। তারা বাড়িতে গিয়ে তাদের পিতামহকে শাস্তির কথা জানালো। তিনি লোকজন নিয়ে স্কুলে এসে হেড মাস্টারকে ঘিরে ফেললেন এবং তার লোকজন পাথর মেরে গুরুদাশ বাবুর মাথা ফাটিয়ে দিলো। তারপরও এই অপমান সহ্য করে তিনি স্কুলে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দারোগা সাহেবের পিতার নির্দেশে দুষ্কৃতকারীরা নিয়মিত হেড মাস্টারের কোয়ার্টারে ঢিল ছুঁড়ত। পরে বাধ্য হয়ে তিনি স্কুল ছেড়ে চলে যান।

তার চলে যাওয়ার দৃশ্যটি আমার স্মৃতিতে এখনো আলোড়ন তোলে। আমি লেখাপড়ায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলি। স্কুল কামাই করে আমাদের বাড়ির নিকটবর্তী এক পুকুরঘাটে চলে যেতাম। এই পুকুর পাড়ে দরিদ্র অনেক ছেলেমেয়ে খেলা করত। আমি তাদের সঙ্গে স্কুল কামাই করে খেলতে যেতাম। ওই খানে আমার বন্ধুত্ব হয় পুষ্প নামে এক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে।

আমরা পুকুরঘাটে বসে গল্পে, খেলায় মেতে উঠতাম। দু'জনে এক সঙ্গে সাঁতার কাটতাম। জলে ডুবে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরতাম। একদিন খেলতে যেতে আমার দেরি হওয়ায় পুষ্প আমার ওপর রাগ করে বলেছিল, তোর সঙ্গে আর খেলব না। আমি বলেছিলাম, আমার বয়ে গেছে। আমি অন্য কারো সঙ্গে খেলব। সে বলেছিল, তুই আমি ছাড়া কারো সঙ্গে খেলতে পারবি না। আমি বলেছিলাম কেন? সে বলেছিল, আমি তোর বউ। আমি জিভে কামড় দিয়ে বললাম, সে কী করে হয়, তুই তো হিন্দু আর আমি মুসলমান। হিন্দু মেয়ের সাথে কি আর মুসলমান ছেলের বিয়ে হয়। সে বলেছিল, তুই গাধা না, আমিও গরু নই। আমরা উভয়েই মানুষ। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিয়ে হবে না কেন? তার এই কথাটি সারাজীবন আমি মনে রেখেছিলাম। তারপর '৪৭ সালে যখন দেশ ভাগ হলো পুষ্পরা চলে গেল ওপারে। কোনোদিন তার খোঁজখবর নেইনি। আমি তখন চট্টগ্রাম শহরে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের কাজে ব্যস্ত। মুসলিম লীগের সমর্থকদের উস্কানিতে দাঙ্গা যাতে ব্যাপকতা লাভ না করে তার জন্য অবিরাম আমার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলাম। আমার কাজের প্রশংসাসূচক বার্তা পেয়ে কলকাতা থেকে কমরেড অম্বিকা চক্রবর্তী (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের একজন নায়ক) আমাকে কলকাতা সফরের আমন্ত্রণ জানান।

তিনি আমাকে কলকাতার শহরতলীর বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে নিয়ে যান। ওই সব উদ্বাস্তু শিবিরে গিয়ে দেখলাম কী দুর্গতির মধ্যে তারা বাস করছে। নালার দূষিত পানি পান করছে। আর দেখলাম, বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে যুবতী মেয়েদের নিয়ে একদল দালাল দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে। এদের নিয়ে কলকাতা শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে ম্যাসেজ পার্লার। একদিন কমরেড অম্বিকা মামার সঙ্গে একটি ম্যাসেজ পার্লার পরিদর্শন করতে গিয়ে সেখানে পুষ্পকে আবিষ্কার করলাম। পুষ্প আমাকে দেখে না দেখার ভান করল। পরে বলল, তুই এখান থেকে চলে যা, তুই মুসলমান এটা যদি আমার মালিক জানে তোকে কেটে দু'টুকরো করে ফেলবে। কেন এসেছিস এই নরকপুরীতে। আমি তাকে বললাম, আমি তোকে এখানে থাকতে দেব না, তোকে নিয়েই ছাড়ব। আমার যা হয় হবে। সে কেঁদে উঠে বলল, তুই এখান থেকে চলে যা, আমি এখানে সুখে আছি। তুই চলে যা, না হয় প্রাণে বাঁচবি না। বহু চেষ্টা করেও তাকে যখন রাজি করাতে পারলাম না, আমি ম্যাসেজ পার্লার ত্যাগ করে চলে এলাম। কয়েকদিন পর পুষ্পের খোঁজে ওই পার্লারে গিয়ে শুনলাম পুষ্প আত্মহত্যা করেছে।

আমাকে পুষ্প অতি অল্প বয়সে বলেছিল, তুই গাধা না, আমিও গরু নই আমরা মানুষ। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিয়ে হবে না কেন? হিন্দু আর মুসলমান কী? এভাবে বহু বছর কেটে গেল, আমরা গরু আর গাধাই রয়ে গেলাম। হিন্দু আর মুসলমানই রয়ে গেলাম। মানুষ হতে পারলাম না। দেশ বিভাগ ছিল আমাদের ইতিহাসের একটি অভিশাপ। এই অভিশাপের ফলে লাখ লাখ নর-নারীকে জীবন দিতে হয়েছে। পুষ্পের মতো হাজার হাজার নারী দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। যে কারণে দেশ ভাগ করা হয়েছিল তার ফল কি আমরা পেয়েছি? হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা কি মিটেছে? মানুষের অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের সমস্যা কি মিটেছে? সেই থেকেই মনুষ্যত্বের পাঠ নিয়ে আমি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছি। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে বের করেছি মাসিক 'সীমান্ত'। কাজ করে আসছি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জন্য। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি, ভাষার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে সাড়া জাগানো কবিতা লিখেছি। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের জন্য কাজ করেছি। ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে হরিখোলার মাঠে ৪ দিনব্যাপী সংস্কৃতি সম্মেলন করেছি। ৫২ সালে কুমিলৰা, ৫৪ সালে ঢাকায় সাহিত্য সম্মেলনে চট্টগ্রাম থেকে কয়েকশ' প্রতিনিধি নিয়ে যোগদান করেছি। প্রতিটি গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি।

এসব গণআন্দোলনের ফলে ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে। ১৯৭১ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের কবর দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছি। কিন্তু সত্য বলে যা অর্জন করেছি তা আজ মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ এবং জঙ্গিবাদের ফলে দেশ আজ ধ্বংসের মুখোমুখি।

আমরা বাঙালি থেকে আবার হিন্দু-মুসলমান হয়ে যাচ্ছি। ধর্মনিরপেক্ষতার স্থান দখল করেছে সংবিধানে ইসলাম জাতীয় ধর্ম, গণতন্ত্রের জায়গায় স্বৈরতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে। দেশ প্রজাতন্ত্রের বদলে মুসলিম মডারেট হয়ে গেছে। মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশ স্বাধীন করা হয়েছে দীর্ঘ ৩৫ বছরেও সেই প্রতিশ্রুতি পালন করা হয়নি। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষ এখন মানবেতর জীবনযাপন করছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আজ বিধ্বস্ত। মেধার পরিবর্তে ঘুষ দিয়ে শিক্ষক নিযুক্ত করা হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতিকে স্থান দেয়া হচ্ছে। ক্ষমতায় যারা আসে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম তৈরি হচ্ছে। দেশের অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে। দুর্নীতিতে দেশ ভরে গেছে। কালো টাকায় দেশ ছেয়ে গেছে।

এই মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে ৮০ বছরে পা দিয়েছি। দু'হাতে লিখছি। ন্যায়নীতির দিন সুনিশ্চিত করার জন্য মিছিলে-অনুষ্ঠানে এই বয়সেও যোগ দিচ্ছি। প্রার্থনা করছি যেন দেশে সুদিন আসে।

দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন
সমাজতন্ত্রের পতন নয়

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, না সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা উৎকৃষ্ট এ নিয়ে পৃথিবীব্যাপী ব্যাপক বিতর্ক চলে প্রায় দুশ' বছর। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে এ বিতর্ক ব্যাপকতা লাভ করে। ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ কখনো অস্ত্রের মাধ্যমে, কখনো গুপ্তচর বৃত্তির মাধ্যমে এই সমাজতান্ত্রিক শিশুরাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা চালায়। একে একে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রায় সত্তর বছর টিকে ছিল। ১৯৯১ সালের ২১ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো উলল্লাসে ফেটে পড়ে। পৃথিবীব্যাপী আবার শুরু হয় ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উৎকৃষ্টতা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক। এই সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রভুত্ব বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কারণ বিশেল্লষণ করতে গিয়ে সমাজতন্ত্র বিরোধী চিন্তাবিদদের বক্তব্য ছিল : এক. সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যক্তিগত মেধার স্বীকৃতি না দিয়ে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদের মধ্যদিয়ে তার নাগরিকদের শিল্প প্রণোদনা বিনষ্ট করেছে। দুই. ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে এবং সন্দেহবাদের প্রসার ঘটিয়ে বহু মেধাবী লোককে হত্যা করেছে এবং নির্বাসনে পাঠিয়েছে। তিন. আমেরিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে তার সম্পদের বিপুল অংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করে সোভিয়েতবাসীকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। চার. ফলে জনগণের জীবনের মান উন্নয়ন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। পাঁচ. স্টালিনের মৃত্যুর পর লৌহ যবনিকা তুলে দেয়ার ফলে ওই দেশের জনগণ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে পশ্চিমা দুনিয়ার যে জৌলুস দেখতে পায়, তাতে এ ব্যাপারে সোভিয়েতের ব্যর্থতা তাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে। ছয়. একদলীয় শাসনের ফলে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি তাদের মনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকুতি প্রসার লাভ করে।

এসব চিন্তাবিদ মনে করেন, উৎপাদন ব্যবস্থার মূল প্রেরণাশক্তি মুনাফা। ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুনাফা ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করায় সেখানে কোনো শিল্প উদ্যোগ গড়ে ওঠেনি। প্রযুক্তি এবং আবিষ্কারের ব্যাপারে তারা পশ্চিমা দুনিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। যেখানে আমেরিকা এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে ব্যক্তি উদ্যোগ রাষ্ট্র কর্তৃক উৎসাহিত হয় এবং ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জনে কোনো বাধা নিষেধ নেই, সেখানে প্রতিদিন হাজার রকমের আবিষ্কারের মধ্যদিয়ে সীমাহীন সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যক্তি উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ সাধনের জন্য পশ্চিমা দেশের তুলনায় আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এবং সম্পদ সৃষ্টির ব্যাপারে এত পিছিয়ে পড়ে যে, তাতে ধীরে ধীরে জনগণের আস্থা হারাতে শুরু করে। এই চিন্তাবিদরা মনে করেন, সম্পদ সৃষ্টির মূল প্রেরণা মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি মানুষের সম্পদশালী হওয়ার অবাধ অধিকার। সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জনের অধিকার নেই বলে সম্পদ সৃষ্টিতে কেউ উৎসাহিত হয়ে ওঠে না।

স্টালিনের মৃত্যুর পর থেকেই আমেরিকা গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে সেই দেশের নেতৃবৃন্দকে পশ্চিমা দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়তে কিভাবে সাহায্য করে– এই চিন্তাবিদরা এই সত্য স্বীকার করেন না। গর্ভাচভ যে মার্কিন সাম্রাজ্যের হাতের পুতুল হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটিয়েছে, তাও এরা স্বীকার করতে চান না। তাছাড়া ওদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বিপল্লবী চরিত্র হারিয়ে ক্রমেই সংস্কারমুখী হয়ে পড়ে। এর ফাটল দিয়ে ওখানে ধনতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা প্রসার লাভ করে এবং এক পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে পড়ে।

পশ্চিমা শক্তির সমর্থক চিন্তাবিদদের এই মতামত কতখানি সঠিক এবং কতখানি প্রচারণা তা বোঝার জন্য সমাজতন্ত্র কী, তা জানার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম অবস্থা থেকে শুরু করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত নানা পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে সমাজের বিকাশ হয়। আদিম যুগ এবং সমাজতন্ত্রের দীর্ঘ ব্যবধানের মধ্যে রয়েছে: প্রথমত. দাসযুগ, তারপর ভূমিদাস প্রথা, সামন্তযুগ। সর্বশেষে প্রতিষ্ঠিত হয় পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। আদিম সমাজে শ্রেণী বৈষম্য ছিল না। সমাজতন্ত্রেও শ্রেণী বৈষম্য নেই। শ্রেণী বৈষম্য দেখা দেয় যখন মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনে সক্ষম হয়ে ওঠে। সম্পত্তির ওপর ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি সমাজের কাঠামো অপরটি থেকে ভিন্ন। সমাজের এই রূপান্তর কিরূপে হয়েছে, কোন সূত্রানুসারে হয়েছে, তা জানতে হলে মার্কস্‌বাদের শরণাপন্ন হতে হয়। কার্ল মার্কস্ এই সমাজ বিকাশের সূত্রগুলো আবিষ্কার করেন।

খাওয়া পরার জন্য উৎপাদন করতে হয় সকলকেই। কিন্তু উৎপাদনের জন্য দরকার উৎপাদনের হাতিয়ার বা যন্ত্র। উৎপাদনের জন্য যে যন্ত্র বা হাতিয়ার দরকার তাকেই বলা হয় উৎপাদন শক্তি। আর উৎপাদনের কাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তাকে বলে উৎপাদন সম্পর্ক। আদিম সমাজে পাথরই ছিল হাতিয়ার। পাথর দ্বারা লোকেরা বনে-জঙ্গলে দলবেঁধে শিকার করে বেড়াত। যা পেত তা সমানভাবে ভাগ করে নিত। উৎপাদন শক্তি তখন মোটেই বিকাশ লাভ করেনি। আদিম মানুষের মধ্যে তাই কোনো শ্রেণীবৈষম্য ছিল না। কিন্তু উৎপাদন শক্তি যখন আরো বিকশিত হয়– আগুন, তামা, লোহা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয় এবং মানুষ যখন কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করে, তখন খাদ্যের প্রাচুর্য দেখা দেয়। মানুষে মানুষে শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। সামন্ততন্ত্রের শেষ দিকটায় বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল বিপল্লবী। এরাই সামন্ততন্ত্রের সমাজ কাঠামো ভেঙে দিয়ে ধনতন্ত্রের জন্ম দেয়। পরবর্তীতে উৎপাদন শক্তির বিরাট পরিবর্তন আসে এবং ধন উৎপাদন এত বেশি বিকাশ লাভ করে যে, ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে এই বিকাশকে সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ে। ফলে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক এতে বাধার সৃষ্টি করে। উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে যে বিরোধ বাধে, তাকেই বলা হয় শ্রেণী সংগ্রাম।

ইতিহাসের ধারায় এবং সমাজ বিকাশের পথে রূপান্তর ঘটায় শ্রেণী সংগ্রাম। এই শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে সমাজের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

১৮৭১ সালে পৃথিবীর ইতিহাসে প্যারি কমিউনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপনের প্রথম সজ্ঞান চেষ্টা হয়। কিন্তু সেই চেষ্টা বেশিদিন টেকেনি। ইতিহাসের বিকাশে রাজনীতি, অর্থনীতি, মানুষের জীবনযাত্রা, মানুষের কামনা-বাসনা সমস্ত কিছুকেই ব্যাখ্যা করার যেই দর্শন তাকে বলা হয় ঐতিহাসিক দ্বান্দিক বস্তুবাদ। এর প্রধান প্রবক্তা কার্ল মার্কস্ এবং এংগেলস্। এই দর্শনের বাস্ত বভিত্তি জড়জগৎ। কিন্তু মার্কসীয় জড়বাদের সঙ্গে তার পূর্বগামী অন্যান্য জড়বাদী দর্শনের একটা মৌলগত প্রভেদ আছে। মার্কস্ জড়জগতের যে বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করেছেন সেটা হচ্ছে এই, জড়জগৎ স্থাণু নয়, চলিষ্ণু। দ্বিতীয়ত, এর বিভিন্ন অংশ স্বতন্ত্রভাবে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখছে না। এরা পরস্পর নির্ভরশীল। তৃতীয়ত, জড় পদার্থের পরিবেশে একটা অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আছে এবং জড়জগতের পরিবর্তন চলছে বিপরীত জিনিসের দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে। ফলে সামাজিক বিবর্তন এবং অগ্রগতির পথে আমরা স্থানে স্থানে সম্পূর্ণ ছেদ পাই। মার্কসের এই জড়বাদকে বলা হয় দ্বান্দিক জড়বাদ। এ তত্ত্বটি মার্কস্বাদ হিসেবে পরিচিত। মার্কস্ শুধু এই তত্ত্ব প্রচার করে ক্ষান্ত হলেন না। তিনি তার পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্র আন্দোলনগুলোর অস্পষ্টতা, দুর্বলতা এবং ভুল-ভ্রান্তিগুলো তাঁর লেখায় তুলে ধরলেন। তাঁর সমস্ত মতামত এবং উদ্দেশ্যকে সহজ এবং পরিষ্কার ভাষায় নির্দিষ্ট করে দিলেন। গঠন করলেন প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা। যা ইতিহাসে প্রথম আন্তর্জাতিক হিসেবে পরিচিত। ১৮৪৮ সালে তিনি আর এংগেলস্ দু'জনে মিলে একটি ইস্তেহার বের করলেন। এই ইস্তেহারটি কমিউনিস্ট মেনুফেস্টো হিসেবে বিখ্যাত। ফরাসি বিপৱব, তার পরে ১৮৩০ এবং ১৮৪৮ সালের বিদ্রোহগুলোর পেছনে কী উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, এই ইস্তেহারে তারা তার বিশদ বিশেৱষণ করলেন। দেখিয়ে দিলেন, বাস্তব অবস্থার প্রতিকার করার দিক থেকে এসব আয়োজন কতখানি ভ্রান্ত, অযথেষ্ট এবং দুর্বল। তখনকার গণতন্ত্রবাদীরা যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার কথা বলতেন, এরা তার সমালোচনা করলেন। যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে, সাধারণ লোকের পক্ষে একথাগুলো একেবারেই অর্থহীন। এগুলো হচ্ছে বুর্জোয়া চালিত নির্যাতনমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপরে একটা ভদ্র চেহারার প্রলেপ। তারপরে তারা তাদের নিজস্ব অনুসৃত নীতি, সমাজতন্ত্রবাদের কথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন। ইস্তেহার শেষ করলেন পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিককে উদ্দেশে একটি আহ্বান জানিয়ে : 'দুনিয়ার মজদুর এক হও। তোমাদের হারাবার কিছুই নেই, পায়ের শৃঙ্খল ছাড়া, জয় করে নেবার আছে সমস্ত জগৎ।'

এই তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯১৭ সালে কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপৱব সাফল্য লাভ করে। কাজেই মার্কসবাদ যে দর্শনের জন্ম দিয়েছে তাকে এক কথায় বলা যেতে পারে সমাজ বিপৱবের বিজ্ঞান। এই দর্শনের ভিত্তিতে পৃথিবীব্যাপী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু হয়।

বিজ্ঞানের তত্ত্ব কোনো সময় এক জাগয়ায় দাঁড়িয়ে থাকে না। অবস্থাভেদে, স্থান-কাল ও বস্তুভেদে পরিবর্তিত হয়। তাই সোভিয়েতের পতনকে সমাজতন্ত্রের পতন বলে ধরে নেয়া ভুল। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের জন্য দায়ী সমাজতন্ত্রের প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন সংস্কারবাদী নেতৃত্ব।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক কাঠামো বিচার করতে গিয়ে এর পূর্ববর্তী অবস্থাকে উপেক্ষা করা চলে না। সোভিয়েত ইউনিয়নকে গড়তে হয়েছে ১৯১৭ সালের উপকরণ নিয়ে। নতুন ভিত্তি স্থাপন করতে গিয়ে পুরাতনকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। ১৯১৭ সালে রুশ বিপৱবের মাধ্যমে সরাসরি ওই দেশে একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেনি। এর সুযোগ দিয়েছে মাত্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে অনেকেই এই ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে, সমাজতন্ত্রের জোরে সোভিয়েত রাষ্ট্রের যতটা আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে, জার্মানির মতো একটা দেশে তার চেয়ে অনেক দ্রুততর গতিতে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এর কারণটা সহজেই দেখানো যায়। যেসব দেশে যান্ত্রিক উন্নতি অনেকটা এগিয়ে আছে– সেখানে সমাজতান্ত্রিক নীতি চালু করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সোভিয়েত রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক সংগঠন শুরু হয় ওদেশের অত্যন্ত অনুন্নত অবস্থায়। যখন সেই দেশে ধনতান্ত্রিক উৎকর্ষও চরমে পৌঁছায়নি। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক বিপৱব সম্পন্ন হয়নি (কার্ল মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে রাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছেছে, সে দেশেই বিপৱব সহজতর হবে)। ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় যে আধুনিক যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা ছিল, ব্রিটেনে ছিল তার চারগুণ, জার্মানিতে পাঁচগুণ এবং আমেরিকায় দশগুণ। তারপর যখন চার বছর ধরে বিশ্বযুদ্ধে সমস্ত রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়, সে সময় ঘটল বিপৱব। বিপৱবের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সকল অন্তরায় দূর হলো না। একদিকে গৃহশত্রু এবং অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর আক্রমণে দেশের আর্থিক সঙ্গতি চরমসীমায় গিয়ে পৌঁছল। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শেষ হবার পরও নানা প্রতিকূলতা এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে গোড়াপত্তন হয় সমাজতন্ত্রের।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাফল্য বিচার করতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় আয় কিংবা মাথাপিছু আয় বিচার করলে চলে না। এই বৈরী পরিবেশে হিটলারের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য লাখ লাখ সোভিয়েতবাসীকে জীবন দিতে হয়েছে। পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েতের সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করতে হয়েছে প্রতিরক্ষা খাতে। কাজেই পশ্চিমা দুনিয়ার মতো বিলাসী জিনিসপত্র, পরিধেয় বস্ত্র এবং অধিকাংশ নাগরিককে গাড়ি-বাড়ির মালিক করে দেয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু সত্তর বছর জীবনকালের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া মানবসভ্যতাকে গগনচুম্বী করে গড়ে তুলেছিল। প্রত্যেকটি নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করেছিল। প্রতিটি নাগরিককে পশ্চিমা দুনিয়ার মতো বড় বাড়ি দিতে না পারলেও বাসস্থানের সুযোগ অবারিত করে দিয়েছিল। শ্রমিকদের জন্য যে সমস্ত স্বাস্থ্য নিবাস তৈরি করেছিল, তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

পতিতাবৃত্তি, যৌনরোগ, অপরাধ প্রবণতা, সামাজিক বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করেছিল। নাগরিকের শ্রেয়বোধকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। খেলাধুলায়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন উন্নত বিশ্বের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন রকেটের সাহায্যে সর্বপ্রথম মহাশূন্যে মনুষ্যবিহীন কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক উৎক্ষেপণের কৃতিত্ব অর্জন করেছিল।

উন্নতি বা উন্নয়ন একটি আপেক্ষিক ধারণা। এক. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জনগণের আর্থিক বৈষম্য উপেক্ষা করে চাহিদাকে মূল প্রাধান্য দেয়া হয়, যার অর্থ দেবার ক্ষমতা আছে তার গরজেই পণ্য উৎপন্ন হয়, অভুক্ত দরিদ্রের ভাত কাপড়ের অভাব পণ্য উৎপাদনের গতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরি হয় না, কারণ এই অভাবের পেছনে অর্থ দেবার ক্ষমতা নেই। অপরদিকে ধনীর বিলাসসামগ্রীর অভাব মেটানোর জন্য সমাজে উৎপাদন শক্তি নিয়োগ করা হয়। কারণ, এর পেছনে আছে মুনাফার লোভ। সুতরাং চাহিদার পরিতৃপ্তির সঙ্গে সমাজের কল্যাণের কোনো সম্পর্ক নেই। দুই. সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতির মূলে আছে জনসাধারণের অভাব মেটানোর অঙ্গীকার। এরকম কোনো অর্থনৈতিক দায়িত্ব ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বীকৃত হয় না। তিন. ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিকল্পনাহীন উৎপাদন ব্যবস্থায় যে প্রতিযোগিতা হয়, তাতে প্রতিবছর বহু ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। শেয়ার বাজারে তেজী-মন্দার কারণে কোটিপতি হঠাৎ করে কপর্দকহীন হয়ে পড়ে। চার. ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় নিজেদের গরজে চাহিদা সৃষ্টি করে, বিজ্ঞাপনের জোরে। তাই দেখা যায়, শিল্পোন্নত দেশে শিল্পোন্নতিকল্পে গবেষণায় যেখানে খরচ হয় মাত্র চার কোটি ডলার, সেখানে বিজ্ঞাপনের জন্য খরচ হয় প্রায় একশ' বিশ কোটি ডলার। পাঁচ. ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক মালিক বিরোধ এবং বেকার সমস্যা দিনে দিনে ব্যাপকতা লাভ করে। ছয়. ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় দুর্নীতি, সন্ত্রাস, পতিতাবৃত্তি, যৌনরোগ, এইডস, মানসিক ভারসাম্যহীনতা এবং অপরাধ প্রবণতা খুবই ব্যাপক। সাত. যে নাগরিকের স্বাস্থ্য ইন্স্যুরেন্স করা থাকে না, সে অর্থের অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। অথচ সোভিয়েত রাষ্ট্রে এ ধরনের অনাচার ব্যভিচার এবং দুর্নীতি ছিল না বললেই চলে। সোভিয়েত রাষ্ট্র কেবলমাত্র যে উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি করেছিল তা নয়। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্রমোন্নতিতে একটা নতুন সভ্যতার গোড়া পত্তন করেছিল। কত দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষার প্রসার এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখেছেন। লিখেছেন– 'সোভিয়েত ইউনিয়নে না এলে আমার জীবনের তীর্থযাত্রা অপূর্ণ থেকে যেত।'

বর্তমানে পৃথিবীর বড় বড় পণ্ডিত এবং বিজ্ঞজনেরা মনে করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন সমাজতন্ত্রের পতন নয়। সমাজতন্ত্রবাদ একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যার ভিত্তি। বৈজ্ঞানিক সত্য অবস্থা সাপেক্ষে পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু কখনো মরে না। কারণ, তার শিকড় মাটিতে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সত্তর বছর জীবনে যা মানব সমাজকে দিয়েছিল এবং মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসে মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বের কারণে এশিয়া এবং আফ্রিকার ঔপনিবেশিক দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সব সময় দুর্বল দেশগুলোর পাশে অবস্থান নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে এ দেশগুলোকে রক্ষা করে এবং এসব দেশের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলে। বাংলাদেশ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন না ঘটলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী হিংস্র ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে পারত না।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পদ্ধতিগত রূপান্তরের মধ্যদিয়ে সারাবিশ্বে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হবে। এ বিশ্বাস নিয়ে বিশ্বের নানা দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। খোদ রাশিয়াতেও এ বীজ অঙ্কুরিত হতে দেরি নেই।

দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৩ অক্টোবর ২০০৬

হুইটম্যানের দেশে মানবতার জয়গান

আমেরিকার অভ্যন্তরে আরেকটি আমেরিকা আছে। তার খবর আমরা ক'জনই-বা রাখি। ক'জনই-বা জানি তাদের যুদ্ধবিরোধী কার্যকলাপের কথা।

আমরা জানি ট্রুম্যানের কথা, নিক্সনের কথা, ম্যাকার্থারের কথা, জানি ম্যাকার্থির কথা, জানি জর্জ ডবিব্লউ বুশের কথা। যারা অতীতে কোরিয়ায় সৈন্য পাঠিয়ে শত শত নিরীহ কোরিয়াবাসীকে হত্যা করেছে। জেনারেল ম্যাকার্থার জাপানস্থ হেড কোয়ার্টার থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করত। কোরিয়ায় প্রথম আমেরিকান মৃত সৈনিকের নাম ক্যানেথ স্যাড্রিক। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাকে কোরিয়ার রণক্ষেত্রে পাঠিয়েছিল যুদ্ধ করতে। বিশ বছর তার বয়স। জর্জিনিয়ায় তার আবাস। তার উদ্দেশে কৃষণ চন্দর একটি খোলা চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে বলেছিলেন, "স্যাড্রিকের মৃত্যু সংবাদটি পরিবেশিত হয় জেনারেল ম্যাকার্থারের জাপানস্থ হেড কোয়ার্টার থেকে। খবরটা জানার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একটি চিঠি লিখব মনস্থ করি। একজন মৃত সৈনিক যে আমার চিঠি পড়তে পারবে তা নয়। তবে সম্ভবত আর যাঁরা চিঠিটি পড়বে, আমি আশা করতে পারি সৈনিক ক্যানেথ স্যাড্রিকের ডান পকেটে, যেখানে রয়েছে একটি সোনার ঘড়ি, প্রিয়তমার একটি ছবি, আর মায়ের প্রেরিত শেষ চিঠি, সেখানে ঢুকিয়ে দেবেন।

এবং যখন ম্যাকার্থারের লোক মৃত সৈনিকের জিনিসপত্র তার প্রিয় আত্মীয়বর্গের নিকট পৌঁছে দেবে, আমি আশা করি আমার এ চিঠিটিও মৃতের আত্মীয় বন্ধুবর্গের হাতে গিয়ে পৌঁছবে, হয়তো পশ্চিম জর্জিনিয়ার আরো হাজার হাজার বিশ বছরের ক্যানেথ স্যাড্রিক চিঠিটি পড়তে পারবে, যাদের ভাগ্যেও লেখা রয়েছে একই অদৃষ্টের লিখন।

যদিও মৃত ব্যক্তি আর ফিরে আসবে না; তবু আমার চিঠিটি এতই গুরুত্বপূর্ণ এজন্যে যে, আমেরিকার জনসাধারণ এখনো যদি এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যায়, তবে হয়তো যারা এখনো বেঁচে আছে তাদের বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

যে সংবাদটিতে স্যাড্রিকের মৃত্যুর বিস্তারিত হৃদয় বিদারক খবর প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে এ-ও বলা হয়েছে যে, কোরিয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষে আমেরিকানরা দ্রুত পিছু হটতে গিয়ে আহত নিহতদের ফেলে চলে এসেছিল। সুতরাং সহজে অনুমান করতে পারি কোরিয়ার কোন পর্বত-শিখরে গিয়ে ক্যানেথ স্যাড্রিক, তুমি শেষবারের মতো ঘুমিয়ে পড়েছ।

আমি তোমার বুকে ক্ষত-চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি! দেখতে পাচ্ছি বেদনাক্লিষ্ট তোমার চাহনি। তোমার পাতলা চুলগুলো মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে, ঝলমল করছে স্বর্গের আলোয়।

অত্যন্ত বেদনাক্লিষ্ট মন নিয়ে এবং ক্রোধ নিয়ে আমি নিজের মধ্যে তোলপাড় করছি।

কে তোমাকে এখানে টেনে আনল? কে তোমাকে আদেশ করেছিল জর্জিনিয়া ছেড়ে, নিজের ভাইবোনকে, নিজের মা এবং প্রিয়তমাকে ছেড়ে অন্যের দেশের ওপর উন্মত্ত অভিযান চালাতে!

বিশ বছরের একজন বালক! তার সামনে ছিল সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ, জীবনের শেষ দিনটি অবধি বেঁচে থাকার অধিকার ছিল। একটা বন্দুক তার হাতে দিয়ে কে তাকে কোরিয়ার মাটিতে-পাহাড়ে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল?"

উর্দু সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম কথাশিল্পী কৃষণ চন্দের এই খোলা চিঠি লেখার পর সাতান্ন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সাতান্ন বছরে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বিনা কারণে, বিনা উস্কানিতে, কী করে আমেরিকা কখনো সৈন্য পাঠিয়ে, কখনো তাদের অনুগৃহীতদের দ্বারা একের পর এক দেশ আক্রমণ করেছে। তারা কঙ্গোর দেশপ্রেমিক, মহান নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বাকে পেছন দিক থেকে ধাওয়া করে হত্যা করেছে। ভিয়েতনামে সৈন্য পাঠিয়ে সেখানকার অসংখ্য নিরীহ জনগণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। মাইলাই নামের গ্রামটিকে নির্দয়ভাবে পুড়িয়ে দিয়েছে। যেখানে স্যাড্রিকের মতো অসংখ্য আমেরিকান যুবককে প্রাণ দিতে হয়েছে। এখনো আমেরিকার মানসিক হাসপাতালে ভিয়েতনাম ফেরত আমেরিকান সৈনিকরা মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

আমি ঘৃণা করি ম্যাকার্থির আমেরিকার সেই সময়টাকে, যখন ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে রোজেনবার্গ দম্পতির প্রাণ হরণ করা হয়েছিল। যখন তারই উস্কানিতে চার্লি চ্যাপলিনের মতো একজন বিশ্বনন্দিত মহান অভিনেতা আমেরিকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমি দেখেছি, বলিভিয়ায় এরা মানবতার শ্রেষ্ঠ সন্তান চে'গুয়েভারাকে হত্যা করেছে।

আমি দেখেছি, ইন্দোনেশিয়ায় তাদের নির্দেশে জেনারেল সুহার্তো দশ লাখ লোক হত্যা করেছে। তাদের নির্দেশে ইরানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফাতেমীকে স্বাধীন তেলনীতি প্রবর্তনের কারণে ফাঁসি দিয়েছে। ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেককে পদচ্যুত করেছে। তারপর দেখেছি, চিলির নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য জেনারেল পিনোশের নেতৃত্বে সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রী আলেন্দেকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তানে তাদের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে অসংখ্য আফগান নর-নারীকে হত্যা করে তাদের তাবেদার সরকার গঠন করেছে। আমরা তালেবানি সরকারকে নীতিগতভাবে ঘৃণা করি এবং এই আশায় থাকি যে, একদিন আফগানিস্তানের জনগণ স্বৈরাচারী তালেবান সরকারকে উচ্ছেদ করে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। আফগানিস্তানের জনগণ কোন ধরনের সরকার পছন্দ করে সে বিচার করার সম্পূর্ণ অধিকার সেখানকার জনগণের। বাইরে থেকে সৈন্য পাঠিয়ে তাদের ওপর পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই। অথচ আমেরিকা তাই করেছে।

এবার আসা যাক, ইরাক যুদ্ধে। ইরাকে আণবিক বোমা তৈরি করা হচ্ছে, এরূপ একটি মিথ্যা অজুহাতে প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাক আক্রমণ করেছিল। কিন্তু ইরাক যে আণবিক বোমা তৈরি করেছে এ ধরনের কোনো তথ্য প্রমাণাদি পাওয়া যায়নি। তারপরও

নির্লজ্জভাবে ইরাক আক্রমণ করা হয়েছিল ধর্মরাষ্ট্র ইসরাইলের স্বার্থে এবং মধ্যপ্রাচ্যের তেলসম্পদের ওপর মার্কিন প্রভাব বজায় রাখার জন্য।

সাদ্দাম হোসেন ছিলেন ইরাকি জাতীয়তাবাদের অবিসংবাদিত নেতা এবং রাষ্ট্রনায়ক। ইরাকের আধুনিকায়নে সাদ্দাম হোসেনের অবদান কেউ ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। তার শাসনামলে ইরাককে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য তিনি কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছেন। ইরাকের জনগণ যদি মনে করে সাদ্দাম হোসেন তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন, স্বৈরাচারের মতো দেশ শাসন করছেন, তাহলে তাকে সরানোর দায়িত্বও ইরাকের জনগণের, যুক্তরাষ্ট্রের নয়। অথচ সকল রকম লজ্জা এবং কূটনৈতিক আচরণ বিসর্জন দিয়ে সাদ্দামকে মুসলমানদের পবিত্র ঈদুল আযহার দিবসে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অমানবিকভাবে বিশ্বব্যাপী টেলিভিশনে প্রচার করেছে।

আমি ইতিহাসের এমন একটি দলিলের কথা জানি, মনুষ্যত্ব যার কাছে হার মানবে। এতে স্বাক্ষর রয়েছে রাজনীতিবিদ পল রেনল্ড-এর। যিনি ফরাসি দেশের এককালের বিশ্বাসঘাতক পেঁতাকে তার ডেপুটি করেছিলেন। আর স্বাক্ষর রয়েছে কবি পল ক্লডেলের যিনি পেঁতার জয়গান করেছিলেন কবিতার মাধ্যমে। এই দলিলে এ কথাই লেখা হয়েছিল, কোটি কোটি নিরীহ মানুষকে ধ্বংস করে দিতে হবে। এই দলিলে সুপারিশ করা হয়েছিল এটম বোমায়, হাইড্রোজেন বোমায় এবং জীবাণু বোমায় বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পৃথিবীর কোটি কোটি লোককে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য।

এই বর্বরতার স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিয়েছে এখন মধ্যপ্রাচ্যে। আরো কত বর্বরতার দৃশ্য আমাদের অবলোকন করতে হবে জানি না।

আমি ওই আমেরিকাকে ঘৃণা করি– যে আমেরিকা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর ভয় দেখিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল।

আমি এই লেখায় শুধু আমেরিকার বর্বরতার কথা লিখতে বসিনি। আমি সেই মহান আমেরিকার কথাও লিখতে বসেছি, যে আমেরিকার জন্ম দিয়েছিলেন সত্যের পূজারি, দেশপ্রেমিক জর্জ ওয়াশিংটন। স্কুল জীবনে আমি তাঁর জীবন কাহিনী পাঠ করে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম এবং ভেবেছিলাম আমেরিকা হচ্ছে এমন একটি দেশ যেখানে অত্যন্ত সৎ ব্যক্তিরাই বাস করেন। যারা সব সময় সত্য কথা বলতে ভালোবাসেন।

দক্ষিণের পরাধীনতার বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং গৃহযুদ্ধে যে মহান আমেরিকানরা লড়াই করেছিল, বিশ্বের মানুষ এখনো তাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখে। আমি সেই আমেরিকাকে এখনো শ্রদ্ধা করি।

আমি ওই আমেরিকাকে এখনো শ্রদ্ধা করি, যে আমেরিকা স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশ করতে আর জনসাধারণের প্রতি গভীর আস্থা রাখতে শিখিয়েছিল আমাকে কিশোর বয়সে।

আমি আমেরিকার সেই মহান রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকনকে শ্রদ্ধা করি। যিনি আমেরিকার কালো আধিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিয়েছিলেন এবং গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। যিনি মানুষকে স্বাধীনতার বিজয় সৌধের কথা শুনিয়েছিলেন।

যে প্রথম অভিযাত্রী দল বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়ে আমেরিকার আদিম প্রান্তরে প্রগতিশীল সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিলেন– আমি তাদের শ্রদ্ধা করি।

এই প্রসঙ্গে আমি জন এফ কেনেডির প্রতিও শ্রদ্ধা জানাই। যিনি স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের জন্য বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন এবং বিশ্বযুদ্ধ বন্ধের জন্য সহ-অবস্থানের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। প্রগতিশীল মতবাদ প্রচারের জন্য যাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হত্যা করা হয়েছিল। যিনি আমেরিকাকে জর্জ ওয়াশিংটন, জেফারসন, আব্রাহাম লিংকন এবং রুজভেল্টের মহত্ত্বর ধারায় পুনর্বাসিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

আমি শ্রদ্ধা করি আমেরিকার মানবতাবাদী কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানকে। যিনি তাঁর কবিতায় সারাবিশ্বের মানুষের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। আমি শ্রদ্ধা করি আমেরিকার মহান কথাশিল্পী আর্নেস্ট হেমিংওয়েকে তাঁর 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি' গ্রন্থে তিনি নিপুন ভাষায় সূর্যাস্তের রক্তরাগের দৃশ্যপট আমাদের চোখে তুলে ধরেছিলেন। তার 'ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস' গ্রন্থে তিনি মানুষকে যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা করতে শিখিয়েছিলেন। আর মনে পড়ে হাওয়ার্ড ফাস্টের কথা। যিনি আমেরিকার শাসকগোষ্ঠী, সমরলিপ্সু এবং ব্যবসায়ী সম্রাটদের পাশাপাশি আমেরিকার সরল, দ্বিধাহীন, দেবতুল্য মানুষের চিত্র তাঁর গ্রন্থে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তুলে ধরেছিলেন বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামের কাহিনী। তাঁর 'স্পার্টাকাস' এবং 'ফ্রিডম রোড' এখনো বিশ্বনন্দিত।

সাধারণ মানুষের কাছে যুদ্ধ নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। তাদের কাছে যুদ্ধ হচ্ছে শিশুর ঝরে পড়া রক্ত। সন্তানহারা মায়ের নির্জীব চাহনি এবং প্রিয়তমার মুখে নীরব ক্রন্দন।

মার্ক টোয়েন, ড্রিজারের লেখা বই এখনো বিশ্বনন্দিত। সৃষ্টির বেদনায় ভরা, আনন্দোচ্ছল পল রবসনের গান এখনো বিশ্ববাসী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শোনে। যার গান শুনে আমরা হলুদ রঙের ড্যাফোডিলগুলো আমেরিকার বিস্তীর্ণ এলাকায় ফুটতে দেখি। আমেরিকার প্রান্তরের মাঠে নিপুণ হাতে দৃপ্ত ভঙ্গিতে যারা কাজ করে তাদের কণ্ঠ শুনতে পাই। তার গানে শিশুদের উৎফুল্ল কলহাস্য আমি শুনতে পাই। পাহাড়ের উৎস থেকে বেরিয়ে আসা নদীর কলোচ্ছ্বাস আমি শুনতে পাই। আমি তাঁর গানে বিশ্বের খেটে খাওয়া মানুষের মুক্তির গান শুনতে পাই। পল রবসনের এক একটি গান যখন আমেরিকার কোমল মাটি স্পর্শ করে তখন উপলব্ধি করি আমেরিকা কত অফুরন্ত সৌন্দর্যের দেশ।

আমি আমেরিকার সেই স্বাধীনতার মূর্তিটির দিকে চেয়ে থাকি– যেখানে লেখা আছে :

Send me your tired huddled masses

Yearning to breath free
I lift my lamp besides the golden door.

আমি এখানে উলেৱখ করতে চাই ডিক্সি চিকস্ নামের আমেরিকার সেই সঙ্গীত গ্রুপটির কথা। তিনজন নারী নিয়ে গঠিত এই গ্রুপের নেতা কণ্ঠশিল্পী নাটালি মেইনস্, বেহালা বাদিকা মার্টি ম্যাগুয়েইর এবং গিটার বাদিকা এমিলি রবিনসন। এই সঙ্গীত গোষ্ঠীর যুদ্ধবিরোধী গান কখনো কখনো বিতর্কিত হয়েছে। তারা সবাই টেক্সাসের অধিবাসী। যে টেক্সাসের লোক জর্জ ডবিৱউ বুশ। এই ত্রয়ী ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ‘পথিক সৈনিক’ (ঞ্ৎধাবষষরহম ৎড়ষফরবৎ) নামের সঙ্গীতটি সারা আমেরিকায় গেয়ে মানুষের মনে যুদ্ধবিরোধী সচেতনতার সৃষ্টি করেছিল। এই গান শুনে ক্রন্দনরত এক রমণী তাদের কাছে ছুটে এসে বলেছিল, অতীতকে ক্ষমা করে দাও। তার উত্তরে তারা গেয়েছিলেন–

Forgive, sounds good
Forget, I’m not sure I could
They say time heals everything
But I’m still waiting.

২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধ যখন আসন্ন তখন এই ত্রয়ী একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ডব ধৎব ধষষ সড়ঃযবৎং. ডব শহড়ি ঃযব ৎবধষ ঢ়ধরহ ড়ভ অসবৎরপধহ ড়িসবহ ড়ঁঃ ঃযবৎব যিড় ধৎব ঢ়ৎড়নধনষু ংধুরহম মড়ড়ফনুব ঃড় ঃযবরৎ পযরষফৎবহ ভড়ৎ ঃযব ষধংঃ ঃরসব. এর ফলে তাদের গানের অ্যালবাম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। রেডিও এবং টেলিভিশনে তাদের গান সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে যখন তারা গান গাইত, তখন যুদ্ধ-উন্মাদ বহুলোক তাদের শারীরিকভাবে আক্রমণ করেছিল। তাদের কাছে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তারপরও তারা থামেনি। বরঞ্চ আরো অধিক যুদ্ধবিরোধী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বুশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে পথে পথে কনসার্টের আয়োজন করেছে। এই ব্যাপারে অনেকে বুশের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, নৈতিকভাবে পরাজিত বুশ বলেছিলেন, আমেরিকা গণতন্ত্রের দেশ, এখানে স্বাধীনভাবে যে কেউ গান করতে পারে। তার উত্তরে এই ত্রয়ী গান বেঁধেছিলেন। ঘড়ঃ ৎবধফু ঃড় সধশব হরপব. বলেছিলেন, যে লোক বলেন আমেরিকায় গণতন্ত্র আছে, সে কেন ইরাকের গণতন্ত্রকে হরণ করতে লৰ লক্ষ ইরাকি জনগণ হত্যা করেছে। এই উদ্যমী সাহসী ত্রয়ী প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এখনো যুদ্ধবিরোধী গান করে চলেছেন আমেরিকার সর্বত্র। আনন্দের কথা, এই ত্রয়ী যুদ্ধবিরোধী গানের জন্য এবার আমেরিকায় নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে তুলনীয় সঙ্গীতে সর্বোচ্চ পুরস্কার ‘গ্রামি অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছেন।

সম্প্রতি ক্যারি আন্ডারউড নামের গ্রামে বসবাসকারী বাইশ বছরের এক তরুণী তার অপূর্ব কণ্ঠ সঙ্গীতের জন্য দশ হাজার শিল্পীকে অতিক্রম করে আমেরিকান আইডলে পরিণত হয়েছেন। তিনিও ‘গ্রামি অ্যাওয়ার্ডে’ ভূষিত হয়েছেন। এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে ওষষ ংঃধহফ নু ড়ঁ - নামের একটি গীতিগুচ্ছ পরিবেশন করে যে অর্থ উপার্জন করেন তা থেকে দশ লক্ষ ডলার আফ্রিকার পুষ্টি বঞ্চিত এইডস্ রোগীদের সন্তান-সন্ততির সাহায্যার্থে বিতরণ করেন। ওকলাহামার ছোট্ট একটি গ্রাম চেকোতাহর অধিবাসী এই ক্যারি আন্ডারউড ২০০৬ সালে বড়দিনে ইরাক গিয়েছিলেন এবং সেখানে ইরাকি জনগণ এবং আমেরিকান সেনাদের উদ্দেশে শান্তির গান করেছিলেন। গানের উদ্ধৃতি–

And every tear that had to fall from my eyes,
Everyday I wondered how I’d get through the night,
Every change, life has thrown me,
I’m thankful, for every break in my heart,
I’m grateful, for every scar,
Some pages turned,
Some bridges burned,
But there were lessons learned.

আমেরিকায় যুদ্ধবিরোধী প্রচুর মানুষ, শিল্পী, সাহিত্যিক, কণ্ঠশিল্পী আছেন, যারা যুদ্ধকে ঘৃণা করেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পান না। যুদ্ধের বিরুদ্ধে মিছিল বের করেন। এ দেশে আমরা ক’জনই-বা সেই সব সাহসী মানুষদের খবর রাখি। ক’জনই-বা তা বিশ্বাস করি। তবে এ কথা সত্যি যে, দিনে দিনে আমেরিকায় যুদ্ধবিরোধী মানুষের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত এ সব শিল্পীর প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। যাদের গান শীতের রাতে কারখানার শ্রমিক এবং সমুদ্রের নাবিকদের প্রাণে উত্তাপ দেয়। আমি আমেরিকার চাষীদের হাতে বিপন্ন বীজগুলোর প্রতি অগাধ আস্থা রাখি। আমেরিকার জনগণের শুভবুদ্ধির ওপর আমি আস্থা রাখি। আমি আমেরিকার মায়েদের কোমল হৃদয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি। যাদের সন্তানদেরকে যুদ্ধবাজরা ইরাক, আফগানিস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে চায়।

দৈনিক যুগান্তর, ২৩ মে ২০০৭

প্রিয়বন্ধু শামসুর রাহমান

তার কুশল কামনায়

১.

বরেণ্য কবি শামসুর রাহমানের শারীরিক অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন। এর কিছুদিন আগে তিনি চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে। সেখানে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। দীর্ঘক্ষণ তার পাশে কাটিয়েছি। তখন তিনি কথা বলতে পারতেন। একবার আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি সেই হাত আমার মুখে লাগালে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, আপনাকে অন্তত আরো বিশ বছর বাঁচতে হবে।

বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনটেনসিভ কেয়ারে কার্ডিওলজি বিভাগে আছেন। তার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তারা গত সোমবার কবির স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। গত মঙ্গলবার আবার বসেছিলেন। গত শনিবার রাতে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে প্রথমে তাকে হৃদরোগ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডাক্তারদের পরামর্শে রোববার তাকে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। শেখ মুজিব মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কার্ডিওলজি বিভাগের চিকিৎসক জানান, গত সোমবার তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে। তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কমে গেছে। যে কোনো সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। শ্বাসকষ্ট, হৃদরোগ ও কিডনিজনিত সমস্যার সঙ্গে দেখা দিয়েছে জন্ডিস। এখন আবার ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স দেখা দিয়েছে। ফলে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেয়া যাচ্ছে না। এই সংকটাপন্ন অবস্থায় কবিকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর কোনো বিকল্প নেই।

শামসুর রাহমান দেশের একজন বরেণ্য কবি। তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ ষাট বছরের বন্ধুত্ব। তিনি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত আমার 'সীমান্ত' পত্রিকায় লিখতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে সাহিত্য-সংস্কৃতিভিত্তিক পত্রিকা হিসেবে মাসিক 'সীমান্তের' নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আপনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'সীমান্ত' হয়ে উঠেছিল পূর্ব বাংলার অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী, প্রগতিশীল উদারনৈতিক লেখকদের একটি প্রিয় পত্রিকা। মাহবুব, আপনার আমন্ত্রণে অনেক নামজাদা লেখক সাড়া দিয়েছিলেন, স্বল্পখ্যাত লেখককেও আপনি উপেক্ষা করেননি। আপনার কি মনে পড়ে? সেকালে আমার মতো একজন প্রায় অজ্ঞাত কবিকেও 'সীমান্তে' লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। তখন আমার নাম কজনেই বা শুনেছে। কজনেই বা গ্রাহ্য করেছে আমাকে কবি বলে। 'সীমান্তে' আমার কোন কোন কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তাও মনে ছিল না।

আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয় কখন মনে পড়ে না। আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন, আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমান। তখন আমরা তিনজনই ছিলাম তরুণ। আপনি সম্ভবত আমার চেয়ে দেড়-দু'বছরের বড়। আপনাকে দেখলাম সুশ্রী, তেজী অথচ অমায়িক, চটপটে তীক্ষ্ণধী। দেখেই আপনাকে আমার ভালো লেগেছিল।"

আমারও তাকে খুব ভালো লেগেছিল– গৌরবর্ণ, উন্নত ললাট, বিনয়ী, সজ্জন। কথা খুব কম বলতেন, নিজের সঙ্গে কথা বলতেন বেশি। রাজনৈতিক আলোচনায় অংশও নিতেন। 'সীমান্তে' তার লেখা ছাপাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতাম। কলকাতায় তার কবিতা নিয়ে বিভিন্ন কাগজে ছাপাতে দিয়েছিলাম, সে কথাও এখন মনে পড়ছে। সেই অকৃত্রিম প্রাণপ্রিয় বন্ধুর জীবন এখন সংকটাপন্ন। তার পাশে গেলেই আবেগে আমার কান্না আসে।

একটি দেশ আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত হয়ে ওঠে তার বরেণ্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের কারণে। দেশের গৌরবও বৃদ্ধি পায় তাদের জন্য। শামসুর রাহমান আমাদের কাব্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। দেশ-বিদেশে তার খ্যাতি ছড়িয়ে আছে। তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।

এই কবি যদি চিকিৎসার অভাবে সুস্থ হয়ে না ওঠেন, তাহলে জাতি হিসেবে আমাদের মর্যাদা ধুলায় লুণ্ঠিত হবে। আমাদের কীর্তিমান কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি আমরা লজ্জাজনকভাবে উদাসীন।

আমি সরকারের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে বিদেশে পাঠানো হয়।

দৈনিক ভোরের কাগজ এবং দৈনিক যুগান্তর, ৯ আগস্ট ২০০৬

২.

শামসুর রাহমানের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় ৬০ বছর আগে, হয়তো তার বেশিই হবে। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে আমি চট্টগ্রাম থেকে 'সীমান্ত' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা বের করি। ওই পত্রিকায় পশ্চিম বাংলার বড় বড় লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমল ঘোষ, পূর্ণেন্দু পত্রী– প্রায় সবাই লিখতেন। এখানকার লেখকদের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ড. এনামুল হক, নবীনদের মধ্যে সরদার ফজলুল করিম, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখ। সেই সুবাদে আমার প্রায়ই ঢাকা আসতে হতো লেখা যোগাড় করার জন্য।

তখনকার দিনে দেবপ্রিয় বড়ুয়া পরে ডিপি বড়ুয়া হয়ে গেলেন। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় ম্যানেজিং এডিটর হয়েছিলেন। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, শামসুর রাহমানের সহপাঠী। থাকতেন ঢাকা হলে। আমি ঢাকায় এলে হোটেল কিংবা আত্মীয়-স্বজনের বাসায় না উঠে দেবপ্রিয় বড়ুয়ার ওখানেই উঠতাম। এক সময় ওই রুমই হয়ে ওঠে আমাদের আড্ডাস্থল। সেখানে আসতেন ঢাকার প্রগতিশীল কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ। ওই আড্ডায়ই একদিন আমাদের বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমান নিয়ে এলেন এক সুদর্শন যুবক শামসুর রাহমানকে। একদিন শামসুর রাহমানের কাছে আমি 'সীমান্তে'র জন্য লেখা চাইলাম। সারাজীবন তাকে দেখেছি, লাজুক স্বভাবের লোক। অতিশয় সরল, ভদ্র, সজ্জন, বিনয়ী। তিনি পরের দিনই একটি কবিতা নিয়ে দেবপ্রিয়র রুমে আমাকে দিলেন। এখানে উলেৰখ করা প্রয়োজন, তখন শামসুর রাহমান তার নাম 'স' দিয়ে লিখতেন। কবিতাটি যথাসময়ে ছাপা হয়েছিল 'সীমান্তে'। আমার কাছে একটি চিঠিতে 'সীমান্ত' প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, আপনার 'সীমান্তে' এপার বাংলা ওপার বাংলার সব নামজাদা লেখকদের লেখা ছাপা হতো। আপনি স্বল্পখ্যাত লেখকদেরও আপনার কাগজে লেখার সুযোগ দিতেন। মনে আছে কি মাহবুব, আপনার কাগজে লেখার জন্য আপনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। আমি মাঝে মাঝে লিখতামও। তখন শামসুর রাহমান বলে একজন কবিকে কেই বা স্বীকৃতি দিয়েছে। কেই বা চিনত আমাকে। আপনার কাগজে লেখার সুযোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছিলেন। শামসুর রাহমান ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন এ দেশের একজন অন্যতম প্রধান কবি। মনে পড়ছে, তার কিছু কবিতা দেবপ্রিয় বড়ুয়ার মারফতে সংগ্রহ করে কলকাতার পূর্বাশা, বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' এবং প্রগতিশীল মাসিক 'পরিচয়ে' ছাপাতে দিয়েছিলাম। তারা মর্যাদার সঙ্গে কবিতাগুলো ছেপেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে কলকাতার কবি-সাহিত্যিকদের কাছে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। এবার আমার মারফত নয়, সরাসরি তার কাছে চিঠি লিখে তাকে লেখার জন্য তাগিদ দিত তারা।

হুমায়ুন কবির সম্পাদিত তখনকার দিনে সবচেয়ে নামিদামি সাহিত্য ত্রৈমাসিক পত্রিকায় তার কবিতার মূল্যায়ন করে একটি বড় লেখা লিখেছিলেন– লেখকের নাম ভুলে গেছি।

শামসুর রাহমান নারীর প্রেম-প্রকৃতি এবং দেশাত্মমূলক কবিতা লিখেছেন। তিনি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন দেশাত্মমূলক কবিতা লিখে। তবে তার দেশাত্মমূলক কবিতা স্বেৰাগানধর্মী ছিল না। তিনি লেখার সময় কবিতার নন্দনতাত্ত্বিক দিকটা ভুলে যেতেন না। ফলে তার কবিতা কবিতাই হতো, স্বেৰাগান হতো না। তার বেশিরভাগ কবিতা পয়ার ছন্দে লেখা। মাত্রাবৃত্ত কোথাও কোথাও আছে। তিনি পয়ার ছন্দে এমন একটি নিজস্ব আঙ্গিক তৈরি করেছিলেন, যা ছিল তার কবিতার বৈশিষ্ট্য।

তিনি শুধু এপার বাংলায় নন, ওপার বাংলায়ও একজন খ্যাতনামা কবি। বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে তার কবিতা খুবই জনপ্রিয়।

জীবনানন্দ দাশ বলেছেন, সবাই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। কিন্তু শামসুর রাহমান ছিলেন কেউ কেউ কবির মধ্যে বিশেষ ধরনের কবি।

বড় কবিদের মূল্যায়ন করার একটি সহজ মানদণ্ড হলো তার কবিতায় আমরা কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি কি না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লে বোঝা যায়, এটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা। তেমনি নজরুল এবং জীবনানন্দ দাশের কবিতায় তাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর শনাক্ত করা যায়। শামসুর রাহমান জনপ্রিয় কবি এ কারণেই যে, তার কবিতায় আমরা তার নিজস্ব কণ্ঠ শুনতে পাই। বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এটা শামসুর রাহমানের কবিতা।

আমরা অনেকেই কবিতা লিখি। কিন্তু আমাদের ক'জনেরইবা আছে নিজস্ব কণ্ঠস্বর। শামসুর রাহমানের তা ছিল।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন তার কবিতা বিশিষ্ট। তেমনি বিষয়বস্তু তৈরি করত কবিতার আঙ্গিক। এখানেও শামসুর রাহমান অনন্য।

আমি ঢাকায় এসেছি প্রায় ২৮ বছর। এই কারণে তার সঙ্গে দেখা হতো ঘন ঘন। তিনি আমার কাছে একটি খোলা চিঠিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আপনার মতো একজন অগ্নিঝরা কবিতার লেখক, রাজনীতিতে প্রগতিশীল ধারার নায়ক, একুশের প্রথম কবিতার জনক– কেন ক্রমে ক্রমে এসব ক্রিয়াকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন, জানতে বড্ড ইচ্ছা হয়।' হ্যাঁ, ঠিকই আমি অনেকদিন রাজনীতির ওপর হতাশাগ্রস্ত হয়ে লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কোনো অনুষ্ঠানে, মিছিলে আমাকে পাওয়া যেত না। এ নিয়ে বন্ধু হিসেবে তিনি আমার প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন।

গত বছর আমার একশ'টি কবিতার সঙ্কলন 'সূর্যাস্তের রক্তরাগ' বের হয়। তাছাড়া আমি মিটিংয়ে-মিছিলে অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে শুরু করেছি গত কয়েক বছর ধরে। কলাম লিখছি, প্রবন্ধ লিখছি, কবিতা লিখছি। তিনি এতে এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, একবার টেলিফোনে আমাকে বলেছিলেন, 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' কবিতার জনক মাহবুব উল আলম চৌধুরী নিজের ক্ষেত্রে ফিরে এসেছেন দেখে খুবই আনন্দ লাগছে।

আমরা অন্যের অগ্রগতিতে আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারে খুবই কৃপণ। শামসুর রাহমানের হৃদয় ছিল এতই প্রশস্ত এবং উদার, তাকে জীবনে কারো নিন্দা করতে দেখিনি। এ রকম একজন অকৃত্রিম বন্ধুকে হারিয়ে আমি খুবই শোকগ্রস্ত।

দৈনিক যুগান্তর, ১৯ আগস্ট ২০০৬

৩.

কবি শামসুর রাহমান আমাদের মূলধারার কবি। মূলধারার কবি বলতে বুঝি সেই ধারা– যে ধারাটি সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, মানবতাবাদী এবং সব ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং বাঙালি জাতীয়তাবোধে বিশ্বাসী।

পাকিস্তানের তমশায় আচ্ছন্ন দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী এ দেশের বহু শিল্পী-সাহিত্যিক মূলধারা থেকে সরে গিয়ে আমাদের সাহিত্যে প্রবর্তন করেছিলেন সাম্প্রদায়িকতা এবং কূপমন্ডূকতা। মূলধারাকে অস্বীকার করে তারা বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন হিন্দুকবি। আর আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, এটা মুসলমানের সংস্কৃতি নয়, এটা হিন্দুর সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যুগের সংস্কৃতি।

এই বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার আগ থেকেই একদল কবি সাহিত্যিক ভাবলেন আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি হবে ইসলামী এবং তা মুসলমানকে নিয়ে, মুসলমানের জন্য। ভাষার রূপান্তর ঘটাতে গিয়ে তারা বললেন, বাংলা ভাষার বর্তমান রূপ অবিকৃত রাখা যাবে না। এই ভাষাকে ইসলামীকরণ করতে হবে। কেউ কেউ বললেন, আরবি অক্ষরে বাংলা লিখতে হবে ইত্যাদি। আর ছিন্নমূল এই সংস্কৃতির নাম দিলেন 'তমদ্দুন'। এই মতাদর্শের হাতের মুঠোর মধ্যে তখন যাবতীয় পত্রপত্রিকা, সাময়িকী, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, প্রচার মাধ্যম এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এত সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও তাদের মধ্য থেকে সত্যিকার প্রতিভার দীপ্তি নিয়ে কেউ বেরিয়ে এলেন না। তাদের হাত দিয়ে এমন কোনো উলেৱখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হলো না, যা সাহিত্যকর্ম হিসেবে উজ্জ্বল এবং ইসলামের উদার ভাবধারায় মহিমান্বিত।

এর বিপরীতে হাজার বছরের ঐতিহ্যের সরসতায়, কঠিন প্রতিকূলতার মাটি ভেদ করে জীবনবিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্কুর উদ্‌গত হতে থাকল– নতুন এবং পুরনো বেশ কিছু শিল্পী-সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিকর্মীর নিরলস প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই আদর্শ প্রেরণার আলোকে যাদের মানসলোকের অন্ধকার ছিল অপসারিত, তারা সবাই এসে যোগ দিলেন এই নতুন কর্মোদ্যমে।

এই প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে, বিভ্রান্তির মধ্যে সুস্থ জীবনবোধ নিয়ে কবিতা লেখায় আত্মনিয়োগ করলেন কবি শামসুর রাহমান। শুধু তিনি একা নন, বহু সঙ্গী-সাথী তার প্রেরণার উৎস হয়ে উঠল। মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিনতা, সুখ-দুঃখের দোলা, ঘর বাঁধার আকুল প্রয়াস, প্রেম-ভালোবাসা এবং দেশাত্মবোধ ফুটে উঠল তার কবিতায়। ছোট বড় সুখ-দুঃখের মধ্যে, জীবনের অসংখ্য টানাপড়েনের মধ্যে স্বদেশ, দেশপ্রেমিকের আত্মত্যাগ, মাটির মমতা, দেশপ্রীতি ও নির্মম নির্যাতনের বিরুদ্ধে দুরন্ত সংগ্রামের বাহন হয়ে উঠল তার কবিতা। প্রবল আদর্শগত বিশ্বাসের প্রেরণায় তার কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠল শুধু নারীপ্রেম এবং প্রকৃতি নয়, গভীর দেশাত্মবোধক কবিতায় তিনি এ দেশের মানুষকে জাগিয়ে তুললেন। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠলেন এপার বাংলা ও ওপার বাংলার জনপ্রিয় কবি– বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষাভাষীদের প্রিয়কবি।

তার দেশাত্মবোধক কবিতাই তাকে জনগণের নিকটবর্তী করেছে। তার মৃত্যুই সাক্ষী দেয় জনগণ কত গভীরভাবে তাকে ভালোবাসে। অনেকের দেশাত্মবোধক কবিতা প্রচারমুখী হয়ে ওঠে। কিন্তু তার কবিতা শব্দের যোজনায়, ছন্দের দ্যুতিতে হয়ে উঠত সত্যিকারের কবিতা। বিষয়বস্তুই তার আঙ্গিককে নিয়ন্ত্রণ করত। কবিতার শরীর নির্মাণে তার পারদর্শিতা তাকে কবিতা প্রেমিকদের নিকটবর্তী করে তোলে।

তিনি শুধু কবিতা লিখে তার সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সীমিত করে রাখেননি। বাঙালি জাতির সংকটে, সংগ্রামে তিনি রাজপথের পথিক হয়েছিলেন। নতুন প্রজন্মের কবিদের তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রেরণার উৎস।

জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, 'সবাই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'। এই কেউ কেউ কবির মধ্যে শামসুর রাহমান অসাধারণ কবি। একজন কবি অসাধারণ কি-না তা বোঝার একটি সহজ মানদন্ড আছে। রবীন্দ্রনাথকে যেমন চিনি তাঁর স্বকীয় মহিমায় এবং কণ্ঠস্বরে, তেমনি নজরুল এবং জীবনানন্দকেও শনাক্ত করা যায় তাদের কবিতার নিজস্ব স্টাইলে, নিজস্ব কণ্ঠস্বরে। শামসুর রাহমানকেও বোঝা যায় তার নিজস্ব কণ্ঠের স্বতন্ত্রতায়।

তিনি শুধু বাংলা ভাষাভাষীদের জনপ্রিয় কবি নন, আধুনিককালের অসাধারণ কালজয়ী কবি। কাল তার কণ্ঠস্বরকে হরণ করতে পারবে না।

দৈনিক সংবাদ, ২৪ আগস্ট ২০০৬

অসাম্প্রদায়িক সাংবাদিকতার অগ্রপথিক আহমদুল কবির

ঘোড়াশালের মিয়া বাড়ির সন্তান আহমদুল কবির। সম্ভ্রান্ত পরিবার, আভিজাত্যে অনন্য। দেশব্যাপী এ পরিবারের একটি খ্যাতি আছে। তাদের আত্মীয়তার বন্ধন বাংলাদেশের অন্যান্য অভিজাত পরিবারের সঙ্গে। দেশের ক্ষমতাসীন উজির-নাজির এবং বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি মাত্রেই তাদের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত। তার বড় ভাই খায়রুল কবির জীবন শুরু করেন কলকাতায় আজাদ পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে। তার ছোট ভাই অকালপ্রয়াত কানু ব্যবসায় আহমদুল কবিরকে সহায়তা করত। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের জামাতা। আহমদুল কবিরের ছোট ভাই শামীম আমাদের ক্রিকেট জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

আহমদুল কবির লেখাপড়া শেষ করার পর পরই কলকাতায় রিজার্ভ ব্যাংকে একটি উচ্চপদে কার্যরত ছিলেন। পার্ক সার্কাস অঞ্চলে চমৎকার একটি ফ্ল্যাটে বাস করতেন। কবি গোলাম কুদ্দুস আমাকে সেই ফ্ল্যাটে নিয়ে যান এবং তার সাথে পরিচিত হই। তার ওই ফ্ল্যাটে কলকাতার কমিউনিস্ট পার্টির বিদগ্ধজনরা আড্ডা বসাতো। তাদের মধ্যে দেখেছি শহীদুলৰাহ কায়সার, সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম, বিখ্যাত কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালিউলৰাহকে। কোনো কোনো সময় সেখানে দেখেছি কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষনেতা ভবানী সেন এবং গোপাল হালদারকে, মনে পড়ে। ওই সময় দাঙ্গা শুরু হলে আহমদুল কবিরকে দেখেছি সেই অঞ্চলের সমস্ত হিন্দুকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিতে এবং পার্ক সার্কাস ময়দানে যে ত্রাণ সমিতি গঠিত হয়েছিল দাঙ্গায় বিধ্বস্ত মানুষদের জন্য, আহমদুল কবির সেখানে ত্রাণকার্যে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। চিরকাল আহমদুল কবিরের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন একজন মহৎ ব্যক্তিকে আমি খুঁজে পেয়েছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মুসলমান সমাজ প্রসন্ন ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বহুদিন মুসলমান সমাজ মুখ ফিরিয়ে ছিল মোলৰা-মৌলভীদের ফতোয়ার প্রভাবে। হিন্দু সমাজ এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলমান সমাজের চাইতে অনেক এগিয়ে যায়। এই শিক্ষার ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে বহু মনীষীর জন্ম হয়। মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্ত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তারা হিন্দু সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা প্রতিযোগিতায় মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে পেরে উঠত না। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার জন্য হিন্দুরা চাকরি-বাকরি এবং বিভিন্ন পেশায় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতেন। এর থেকে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরীভাবের সৃষ্টি হয়। মুসলমান নেতারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তোলে।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করেন। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই ব্যবস্থা রদ হয় ১৯১২ সালে। বলা হয়ে থাকে মুসলমানদের খুশি করার জন্য ঢাকায় স্থাপিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হতো প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। বলা হবেই না বা কেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য স্যার পি জে হার্টগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উলেৰখসংখ্যক জ্ঞানীগুণী শিক্ষকের সমাবেশ ঘটে। তাদের মধ্যে ছিলেন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন বোস, কিংবদন্তী ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. মাহমুদ হাসান, ড. এস এন রায়, ড. অমলেন্দু বসু, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ অমিয় কুমার দাশগুপ্ত; বাংলায় ড. হরিদাশ ভট্টাচার্য এবং মোহিত লাল মজুমদার; রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ড. বি এন ব্যানার্জী; ইংরেজি সাহিত্যে মি. টার্নার প্রমুখ বিশ্বখ্যাত শিক্ষকের সমাবেশ ঘটেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই স্বর্ণযুগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি উজ্জ্বল প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে ছিলেন কবি সানাউল হক, এ কে এম আহসান, আহমদুল কবির, সৈয়দ নূরুদ্দীন, রবিগুহ, সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী, মোহাম্মদ তোহা প্রমুখ কৃর্তী ছাত্র। এরা সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট ভাবধারার সমর্থক। আহমদুল কবির ছিলেন সেই স্বর্ণযুগের একজন কৃর্তী ছাত্র। চিরকাল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের জন্য কখনো নেপথ্যে, কখনো প্রকাশ্যে কাজ করে গেছেন। আহমদুল কবির ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের একজন সক্রিয় কর্মী। সেই সুবাদে তিনি তৎকালীন ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে শুধু জড়িয়ে পড়েননি, তিনি হল ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৪২-৪৩ সালে তিনি সলিমুলৰাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক এবং ১৯৪৫-৪৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নে (ডাকসুতে) তিনি সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। উভয় নির্বাচনেই তিনি ছিলেন ছাত্র ফেডারেশন সমর্থিত প্রার্থী। নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনরা যখন বিভিন্ন মন্ত্রিত্ব পদে অধিষ্ঠিত এবং মুসলিম লীগ জনপ্রিয়তার শীর্ষে সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির মতো একটি কট্টর বামপন্থী দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। আহমদুল কবির ছাত্র জীবনে যেমন ছিলেন, তেমনি কর্ম জীবনেও সেই ভূমিকা অব্যাহত রাখেন। আহমদুল কবিরের বয়স যখন ২ কি ৩, তখন ১৯২৬ সালে ঢাকায় প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে ভারত বিভাগের ঠিক এক বছর আগে এই দাঙ্গা চরম রূপ ধারণ করে। এসব দাঙ্গাবিরোধী অসাম্প্রদায়িক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি যখন সরকারের উচ্চপদে আসীন তখনো এই দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য ঘটেনি।

তিনি চট্টগ্রামে জয়েন্ট কন্ট্রোলার অব ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্টের পদে নিযুক্ত ছিলেন বহুদিন। সে সময় তাকে আমি নিকট থেকে দেখেছি। ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় আমরা যখন দুই হাজার কর্মীর সমন্বয়ে শান্তিফৌজ গঠন করে দাঙ্গা প্রতিহত করছি। তিনি নেপথ্যে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। নেপথ্যেই বলি কেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক সবাইকে নিয়ে আমরা যখন বিরাট মিছিল বের করি তিনি নির্ভয়ে এতে যোগদান করেছিলেন। চট্টগ্রামে তার বাড়িতে নিষিদ্ধ-প্রায় কমিউনিস্ট পার্টির গোপন সভা হতেও আমি দেখেছি। একবার আত্মগোপনকারী কমরেড লাল সিরাজকে তিনি নিজে গাড়ি চালিয়ে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

সয়ীদুল হাসান (একাত্তরে শহীদ) ছিলেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কলকাতা থেকে এসে তিনি আমাদের বাড়ির পাশে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন। এই বাসায় আহমদুল কবিরের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সয়ীদুল হাসান ছিলেন রাজনীতি সচেতন একজন মহৎ ব্যক্তি। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে আমি যখন 'সীমান্ত' নামের মাসিক সাহিত্য পত্রিকা বের করি তখন সয়ীদুল হাসান, আহমদুল কবির, কবীর চৌধুরী, শওকত ওসমান 'সীমান্তে'র নীতি-নির্ধারনের ব্যাপারে সয়ীদ ভাইয়ের বাসায় মিলিত হতাম। 'সীমান্তে'র অর্থকষ্টের সময় আহমদুল কবির আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন।

১৯৫১ সালে 'সীমান্ত' অফিসে আমি আহ্বায়ক হয়ে একটি সভা ডাকি। প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ, সংস্কৃতি বৈঠক, আর্যসঙ্গীত সমিতি, সঙ্গীত পরিষদ, প্রাচ্য ছন্দগীতিকার প্রতিনিধিরা এই সভায় যোগদান করেন। এছাড়া এতে উপস্থিত ছিলেন সয়ীদুল হাসান, আহমদুল কবির, কবীর চৌধুরী, আবুল ফজল, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, শওকত ওসমান, এস এ জামান প্রমুখ চট্টগ্রামের সেরা শিল্পী-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবী। ওই সভায় ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে একটি সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়। অনেকে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। বলেন, মুসলিম লীগের গুণ্ডারা এ সম্মেলন পণ্ড করে দেবে। আমি দাঁড়িয়ে বলি, এদের মোকাবেলা করার মতো শক্তি আমরা অর্জন করেছি। উলেৰখ্য, ১৯৫০ সালে আমরা চট্টগ্রামে ৮টির মতো শরীর চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করি। এই ক্লাবগুলোর সক্রিয় সদস্য ছিল প্রায় দুই হাজার। আমরা এদের নিয়ে শান্তিফৌজ গঠন করে পঞ্চাশের দাঙ্গা ঠেকিয়েছি। আমার বক্তব্যের পর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সময় আবুল ফজলকে সভাপতি, সয়ীদুল হাসান ও শওকত ওসমানকে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং আমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। পরে সম্মেলনে আর্থিক ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারটি এজেন্ডায় আসে। তখন কবীর চৌধুরী এবং আহমদুল কবির আমাকে ইশারাতে বলেন, আর্থিক ব্যাপারটা যেন এই মিটিংয়ে না তুলি। পরবর্তীতে কবীর ভাই, মনু ভাই (আহমদুল কবির) এবং জামান ভাই এই সম্মেলনের ব্যয়ভারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আমিও আমাদের পরিবারের তহবিল থেকে সম্মেলনের ব্যয়ভারের জন্য সাধ্যমতো অর্থ প্রদান করি। আইপিটিএ-র একটি দল যাতে সম্মেলনে যোগ দেয় তার জন্য আমি কলকাতা যাই। সেখানে কমরেড চিত্ত বিশ্বাসের সহায়তায় তাদের বিমানযোগে চট্টগ্রাম আনার ব্যবস্থা করি। আইপিটিএ-র বাইরে এসেছিলেন সুচিত্রা মিত্র, হেনা বর্মণ, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখ। এদের কয়েকজনকে আমাদের বাড়িতে রাখা হয়েছিল। অন্যদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন আহমদুল কবির ও সয়ীদুল হাসান।

আহমদুল কবির আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সবখানে ছিলেন, অথচ কোথাও ছিলেন না। চট্টগ্রামে এই ছিল তার ভূমিকা। ৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রাম সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আমি আহ্বায়ক ছিলাম। সয়ীদ ভাই এবং মনু ভাই প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনে আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। এ সময় এক পর্যায়ে আমার জলবসন্ত দেখা দেয়। আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। অসুস্থাবস্থায় আমি যে ক'দিন বাড়িতে ছিলাম তারা প্রায় প্রতিদিন আমাকে দেখতে আসতেন এবং খোঁজ-খবর নিতেন।

আহমদুল কবির তখন করাচীতে কর্মরত। চট্টগ্রাম এসেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী ফজলুর রহমানের সঙ্গে। কাজী দেউড়িতে ইসমাইল ভাই তাদের ভোজসভায় আমন্ত্রণ করেন। মনু ভাই আমাকে টেলিফোন করে জানালেন এখনই চলে এসো ইসমাইল সাহেবের বাসায়। তোমার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। আমি ওখানে উপস্থিত হলে এককোণায় গিয়ে তিনি আমাকে বললেন, আমি দৈনিক 'সংবাদ' কিনে নিচ্ছি তোমাকে ঢাকায় চলে যেতে হবে। 'সংবাদ' পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে। রাজনৈতিক কারণে আমার পক্ষে চট্টগ্রাম ছেড়ে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস সম্ভব ছিল না। তাই তার অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি।

বাংলা নামের প্রথম পত্রিকা আমরা বের করেছিলাম 'আমার দেশ' ঢাকা থেকে, বেশিদিন চলেনি। সংবাদ হলো ঢাকা থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় বাংলা নামের পত্রিকা। এটা নূরুল আমিনের পত্রিকা বলে পরিচিত ছিল। পত্রিকাটি চালাতেন খায়রুল কবির এবং নাসির উদ্দিন ভাই। ভাষা আন্দোলনেও সংবাদের ভূমিকা পাকিস্তানি শাসকদের পক্ষে ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দেড় বছরের মধ্যে পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দিলেন, তখন বাঙালি মুসলমান পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎকে খুঁজে পেল না। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মানুষের মনে স্বাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে অধিকার বোধ জন্ম নিতে শুরু করে। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে এবং মুসলিম লীগের ভরাডুবির মধ্যে দিন দিন মুসলিম লীগ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বৈরী পরিবেশ থেকে আহমদুল কবির সংবাদকে গণতন্ত্র এবং অসাম্প্রদায়িকতার মুখপত্রে রূপান্তরিত করেছেন। সংবাদের ইতিহাসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ ইতিহাস। ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং গণতন্ত্রকে মুক্ত করার যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ৫২ সাল থেকে তার সম্পূর্ণ ইতিহাস ধারণ করে আছে সংবাদ। সংবাদ আহমদুল কবিরের নেতৃত্বে পঞ্চাশ দশকের বৃত্ত ভেঙে বাঙালি জাতি গঠনে সহায়তা দিয়েছে। সংবাদ বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় নতুন রীতি প্রচলনের অগ্রপথিক।

সংবাদকে আহমদুল কবির শুধু একটি পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেননি। এ পত্রিকা এখন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সংবাদ আহমদুল কবিরের পরিচালনায় আসার পর হয়ে ওঠে বামপন্থীদের একমাত্র আশ্রয়স্থল।

পরবর্তীতে আমি স্থায়ীভাবে ঢাকায় এলে আহমদুল কবির আমাকে সংবাদে যোগ দিতে আহ্বান জানান। সেই প্রস্তাব আমি গ্রহণ করিনি। অন্য কোনো কারণে নয়। আমি জানতাম, তার বন্ধুবাৎসল্য এত বেশি যে, তিনি বন্ধুদের সংবাদে বসিয়ে কোনো কাজ না দিয়ে শুধু শুধু বেতন দিয়ে থাকেন। এসব গল্প আমি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাহাউদ্দীন চৌধুরীর কাছে শুনেছি।

দৈনিক সংবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

জয় হোক সত্যের
জয় হোক দৈনিক সংবাদের

দৈনিক 'সংবাদ' ৫৬ বছর অতিক্রম করে ৫৭ বছরে পদার্পণ করছে, এটা সংবাদ জগতের জন্য যেমন একটি সুসংবাদ তেমনি জাতির জন্যও একটি বড় দৃষ্টান্ত। পত্রিকার রাজা দৈনিক সংবাদ। তাদের অনুসন্ধানী রিপোর্ট, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পূর্বাভাষ সম্বলিত তথ্য, রাজনীতির বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় এবং উপ-সম্পাদকীয় লেখায় সংবাদ তার ঐতিহ্যকে এখনো ধরে রেখেছে। এখনো সংবাদ পড়লে লক্ষ্য করা যায় এর প্রথমপাতার শিরোনাম এবং অন্যান্য সংবাদ কত যত্নের সঙ্গে উদ্ভাবিত এবং পরিবেশিত হয়। সংবাদের চিঠিপত্রের কলাম এক সময় পাঠক সমাজে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল। সেই ধারা কিছুটা ম্লান হলেও এখনো দীপ্তিমান।

সংবাদের সাহিত্য পাতা একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্য কীর্তির বাহন। এক সময় এই পাতা দেখতেন মাসিক কালি ও কলমের সম্পাদক আবুল হাসনাত। তার রুচি, সাহিত্য বিষয়ক গভীর জ্ঞান, সৌন্দর্য-চেতনা এবং দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ এই সাহিত্য পাতাকে অসম্ভব মর্যাদার আসনে বসিয়েছিল। এই সাহিত্য পাতার বিশেষ সংখ্যাগুলো এমন আলোকিত ছিল, যার জন্য অনেকের সংগ্রহে এই সংখ্যাগুলো এখনো সংরক্ষিত আছে।

আবুল হাসনাত নতুন লেখককেও অগ্রাহ্য করতেন না। এই পাতায় তিনি অনেক নতুন লেখক সৃষ্টি করেছেন। দেশের এমন কোনো বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি নেই– যারা এই সাহিত্য পাতায় লেখেননি। এখনো তরুণ ওবায়েদ আকাশ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই সাহিত্য পাতার প্রগতিশীল ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

এক সময় এর মহিলা পাতা সম্পাদনা করতেন প্রবাদপ্রতিম নারী সাংবাদিক লায়লা সামাদ। পরবর্তীতে প্রয়াত হাসি সিদ্দিকী এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এ পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণীয় পাতা 'খেলাঘর'। এই পাতার প্রথম সম্পাদক ছিলেন কবি ও শিশু সাহিত্যিক প্রয়াত হাবিবুর রহমান। পরবর্তীকালে সম্পাদক হন বজলুর রহমান। এই খেলাঘর বহুদিন যাবৎ নানা কর্মকাণ্ড, অনুষ্ঠান, আন্দোলন, মিছিলের মাধ্যমে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক নাগরিকের জন্ম দিয়েছে, যারা 'খেলাঘর'-এর সদস্য হিসেবে এখনো গৌরব বোধ করেন। বজলুর রহমান নিজে একজন দক্ষ সংগঠক হওয়ার কারণে তিনি খেলাঘরকে প্রগতিশীল ধারায় নির্মাণ করেছেন।

অনেকদিন যাবৎ বজলুর রহমান দৈনিক সংবাদের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। আগেই বলেছি, তিনি অত্যন্ত প্রগতিশীল দৃষ্টির অধিকারী। এক সময় ছাত্র রাজনীতিতে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এখনো স্বদেশ এবং দুনিয়াকে দেখেন। তার যোগ্য সম্পাদনায় সংবাদ বহু সংকট, সমস্যা অতিক্রম করে এখনো প্রবলভাবে টিকে আছে।

আমাদের সাংবাদিক জগতের আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল। একজন নিষ্ঠাবান, নীরব এবং প্রচারবিমুখ এক জ্ঞানবৃদ্ধ সাংবাদিক। সংবাদের সঙ্গে তার যুক্ততা দৈনিক সংবাদকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে।

দৈনিক সংবাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন আমার অতি স্নেহভাজন মুনীরুজ্জামান। তিনিও একজন পোড়-খাওয়া সাহসী সাংবাদিক। বহু দৈনিক থেকে অনেক প্রলোভনীয় আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আদর্শগত কারণে দৈনিক সংবাদকে ছেড়ে যাননি। এর প্রত্যেকটি বিভাগে রয়েছেন এমন সব প্রবীণ এবং তরুণ সাংবাদিক, তারা শুধু নিষ্ঠাবান নন– নিবেদিতপ্রাণ।

১৭ মে ১৯৫১ সালে দৈনিক 'সংবাদ' প্রকাশিত হয়, মুসলিম লীগের অর্থায়নে। সম্পাদক ছিলেন স্বনামধন্য সাংবাদিক খায়রুল কবির। তিনি দীর্ঘকাল কলকাতার আজাদ পত্রিকায় কাজ করে সাংবাদিকতায় হাত পাকিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তার অমায়িক ব্যবহার এবং নবীন সাংবাদিকদের প্রতি স্নেহাকূল্যের কারণে তিনি ঢাকার সাংবাদিক জগতের নেতা হয়ে উঠেছিলেন। সংবাদ তখন মুসলিম লীগের কাগজ হলেও খায়রুল কবির ছিলেন অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। তিনি সংবাদ পরিচালনায় তার সাথী হিসেবে পেয়েছিলেন একজন দক্ষ পরিচালক, নাসিরুদ্দিন আহমদ। তার যোগ্য পরিচালনায় দৈনিক সংবাদ ইস্ট পাকিস্তান প্রেস, ২৬৩ বংশাল রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ছয়, মূল্য দু'আনা।

১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের পতনের পর পত্রিকাটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেন প্রয়াত আহমদুল কবির। এ সময় সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়োজিত হন জহুর হোসেন চৌধুরী। বলা বাহুল্য, আহমদুল কবির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেয়ার পর সংবাদ হয়ে ওঠে বামপন্থী শিল্পী-সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকদের কর্মশালা। দেশের জন্য কাজ করতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়ে যেসব শিল্পী সাহিত্যিক কারাগারে আটক হতেন, মুক্তি পাওয়ার পর তাদের বিরাম ও আশ্রয়ের স্থল হয়ে ওঠে দৈনিক সংবাদ। কেউ বিনা বেতনে, কেউ অল্প বেতনে, কেউ মাত্র পারিবারিক ন্যূনতম চাহিদা অনুযায়ী ভাতা পেয়ে অত্যন্ত উদ্যমের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে কাজ করতেন। কারণ, সংবাদ ছিল তাদের মনের মতো কাগজ। ভাবাই যায় না এমন কোনো সাংবাদিকের কথা, যিনি বা যারা কোনো না কোনো সময়ে সংবাদে কাজ না করেছেন। রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, সন্তোষ গুপ্ত, তোয়াব খান, শহীদুলল্লাহ কায়সার, ফয়েজ আহমদ (এক সময় সাহিত্য পাতারও সম্পাদক ছিলেন। সংবাদের চিফ রিপোর্টার থাকাকালীন তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তিনি চার বছর জেলে ছিলেন), জহির রায়হান, সাদেক খান, শহীদ সাবের, কামাল লোহানী, মোহাম্মদ ফরহাদ, আলী আকসাদ, বজলুর রহমান, সোহরাব হাসান থেকে শুরু করে এমন কোনো মুখ খুঁজে পাই না, যারা সংবাদে কাজ

করেননি কিংবা দৈনিক সংবাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে সাংবাদিকতায় হাত পাকাননি। এসব সাংবাদিকদের দেশপ্রেমের দীপ্তিতে সংবাদ এক সময় হয়ে উঠেছিল একটি অনন্য সাধারণ দেশপ্রেমের মশাল।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বরাবরই সংবাদ পত্রিকার প্রতি বিরূপ ছিল। দেশের সব প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে সংবাদ একাত্ম ছিল। যার কারণে দৈনিক সংবাদ ও এর সাংবাদিক এবং কর্মীরা বহুবার পুলিশী আক্রমণের শিকার হয়েছেন, জেল খেটেছেন। ষাটের দশকে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী, আইয়ুব-বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্ব। এসব জাতীয় আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে সংবাদ নির্ভীকভাবে জনগণের সাথে ছিল। এ সব আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার জন্য নানাভাবে পরামর্শ এবং প্রেরণা দিয়ে প্রতিটি আন্দোলনের অগ্রগতিতে সহায়তা দিয়েছে। যার ফলে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে দৈনিক সংবাদকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনী ওই সময় সংবাদের প্রেস, মেশিনপত্র, অফিস পুড়িয়ে দিয়েছিল। এই অগ্নিকান্ডে নিহত হয়েছিলেন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শহীদ সাবের।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পর সংবাদ নতুন উদ্যমে এবং প্রেরণায় আবার প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি পুনরায় সংবাদের প্রকাশনা শুরু হলে এর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আহমদুল কবির স্বয়ং। আহমদুল কবির সংবাদকে শুধু একটি পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেননি, তার নেতৃত্বে দৈনিক সংবাদ পঞ্চাশ দশকের বৃত্ত ভেঙে বাঙালি জাতি গঠনে নিরন্তর সহায়তা দিয়ে আসছে। সংবাদ বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় নতুন রীতি প্রচলনের অগ্রপথিক।

সংবাদের ৫৭ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আমি তীব্রভাবে আমার প্রিয়বন্ধু আহমদুল কবিরকে স্মরণ করছি এবং তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি। প্রার্থনা করি তার যোগ্য উত্তরাধিকারী আলতামাশ কবিরের নেতৃত্বে সংবাদ আপন ঐতিহ্যে যেন উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

নতুন পর্যায়ে পরিচালিত হওয়ার পর থেকে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দৈনিক সংবাদ শরীরে গৌরবের রক্তাক্ত চিহ্ন বহন করে এখনো অগ্রযাত্রায় টিকে আছে। দৈনিক সংবাদ হয়ে আছে ইতিহাসের অংশ। কেউ যদি উদীয়মান বাঙালি জাতির ইতিহাস লিখতে চান, তাহলে সংবাদের পাতা ঘাঁটলেই সহজে তার উপাত্ত পেয়ে যাবেন।

দৈনিক সংবাদে এখনো নানা ধরনের সংকট আছে। কিন্তু এই সংকট, এর কর্মী এবং সাংবাদিকদের মুখের হাসি কেড়ে নিতে পারেনি। এখনো তারা আনন্দোচ্ছল হৃদয় নিয়ে সংবাদকে তার আদর্শগত দায়বদ্ধতায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই ত্যাগ ও নিষ্ঠা খুবই প্রশংসার যোগ্য এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে অনুকরণীয়। আমি দৈনিক সংবাদের দীর্ঘ এবং নির্ভীক জীবন কামনা করি।

জয় হোক সত্যের
জয় হোক দৈনিক সংবাদের।

দৈনিক সংবাদ, ৩১ মে ২০০৭

ওয়াহিদুল হক
বাংলা সংস্কৃতির ক্লান্তিহীন পরিব্রাজক

যদ্দূর মনে পড়ে পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে সরোজের সঙ্গে আমার দেখা। সরোজ মানে, আমাদের অতিপ্রিয় বাংলা সংস্কৃতির ক্লান্তিহীন পরিব্রাজক সদ্যপ্রয়াত ওয়াহিদুল হক। দেখা হয়েছিল হোসনে আরা মাক্কীর বাসায়, আজিমপুরে। বাড়ির নম্বরটা মনে নেই। বাড়ির পাশে ছিল একটি খেজুর গাছ। আমরা বলতাম মরবদ্যান। মাক্কীর ছেলেমেয়েরা ওয়াহিদুলকে ডাকত সরোজ মামা বলে। তাদের কাছ থেকে শিখে মাঝে মাঝে আমিও তাকে সরোজ বলতাম। কেউ তাকে এই নামে ডাকলে খুব খুশি হতো। বাংলা নাম বলেই কথা। কিছুদিন আগে তাকে আমি সরোজ বলে ডাকতেই আবেগে আপপ্লুত হয়ে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আক্ষেপ করে বলে ওই নামে এখন কেউ আমাকে ডাকে না। মাক্কীর ছেলেমেয়েরা ডাকত। এখন তারাও অনেক দূরে সরে গেছে।

ওয়াহিদুলের মতো পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বাঙালি আর কাউকে দেখিনি। এ ব্যাপারে ভয়ানক আপসহীন। বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারার ধারক ও বাহক। আজীবন অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে মাথা উঁচু করে বিরামহীন লড়াই করেছে। কোনোদিন মাথানত করেনি।

ওয়াহিদুলের মানস গড়ে ওঠে পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে। তার সঙ্গীতানুরাগের পেছনেও ছিল পারিবারিক ঐতিহ্য। তার বাবা মাজহারুল হক (এম.এ. এলএলবি) ছিলেন উচ্চ আদালতের একজন আইনজীবী। অবিভক্ত বাংলার আইন সভার সদস্য। তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক উন্নত রুচির সম্ভ্রান্ত মানুষ। তাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে তিনি সঙ্গীত জলসার আয়োজন করতেন। শুনেছি, তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা রচনা করতেন। ওয়াহিদুল দুঃখ করে বলত বাবার কবিতাগুলো সংকলিত হলে আমিও কবিপুত্র হিসেবে তার গৌরবের উত্তরাধিকারী হতে পারতাম। ওয়াহিদুলদের ২৩ নম্বর উর্দু রোডের বাসার সঙ্গীত জলসায় ওস্তাদ খসরু এবং ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেনের পুত্র মনির হোসেন যোগ দিতেন। প্রায় সারারাত ধরেই চলত গানের আসর। গাওয়া হতো খেয়াল, ঠুমরি, গজল, কাজরি। মনির হোসেন চমৎকার টপ্পা গাইতেন। এভাবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি ওয়াহিদুলের আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ওয়াহিদুলের গ্রামের বাড়ি বুড়িগঙ্গার ওপারে হাটিভাওয়ালে। তাদের গ্রামের বাড়িতেও ছিল সঙ্গীতচর্চার পরিবেশ। তার দুই চাচা ছিলেন মারফতি গানের ভক্ত। ওয়াহিদুলের মাকে আমি সেতার বাজাতে দেখেছি। চমৎকার সেতার বাজাতেন।

চট্টগ্রামে আর্য সঙ্গীতের উদ্যোগে প্রায় প্রতিবছর ঠাকুরদার আগ্রহে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সম্মেলন হতো। সেখানে যোগ দিতেন বড়ে গোলাম আলী, এ কানন, ফৈজ খাঁ, পণ্ডিত ওঙ্কার নাথ, ভিম সেন যোশী প্রমুখ ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ। ওয়াহিদুল, নূরবল কাদের এবং টুলু ছিল অভিন্নপ্রাণ বন্ধু। এই সঙ্গীতের টানে এরা তিন বন্ধু বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে চট্টগ্রামে ছুটে যেত। এদের কোনো একজনের আত্মীয় এনায়েত বাজারস্থ রাশেদাদের বাড়িতে উঠতো। প্রাণভরে সারারাত আর্যসঙ্গীত প্রাঙ্গণে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মূর্ছনায় তন্ময় হয়ে থাকত। এই তিন বন্ধুর মধ্যে দুইজন দলছুট হয়ে অন্যদিকে চলে যায়। একজন সফল ব্যবসায়ী। আরেকজন বুদ্ধিদীপ্ত সিভিল সার্ভেন্ট, মুক্তিযুদ্ধের একজন খ্যাতনামা সংগঠক। আর্যসঙ্গীতের সেই গানের আসরে আমাকে নিয়ে যেত আমার সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু সুচরিত চৌধুরী। ওই সুবাদে তাদের সঙ্গে আমাদের সাময়িক পরিচয়। স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় ওয়াহিদুল ওস্তাদ তছর আলীর কাছে প্রথম সঙ্গীতের তালিম নেয়। এরপর যদ্দূর শুনেছি আর কারো কাছে গান শেখেনি।

চট্টগ্রামে গেলে ওয়াহিদুল আমার বাড়িতেই থাকত। এ প্রসঙ্গে সে লিখেছে– মাহবুব ভাইয়ের স্ত্রী বুলবুল নিশ্চয়ই আমাকে গ্রহণযোগ্য মনে করতেন। তা না হলে ওদের বাড়ি কী করে আমার চট্টগ্রামস্থ তীর্থে পরিণত হতে পারতো। বুলবুল নানা কাজে ব্যস্ত থাকতো। সে অভাব ভালো করেই পূর্ণ করেছে তাদের কন্যা মুন্নি। তাকে গান করাতে আমার শ্রান্তি-ক্লান্তি ছিল না। ও যেন শুষে নিত সব। কতিপয় উদ্দেশ্য সামনে রেখে সে ঘন ঘন চট্টগ্রামে যেত। চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, চট্টগ্রামের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পারদর্শী গুণীজনের গান শোনা, কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়েকে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং গান শেখানো।

ওয়াহিদুল চট্টগ্রাম গেলে রাতে তার জন্য সঙ্গীত আসরের আয়োজন করতে হতো। চট্টগ্রামের প্রবাদতুল্য সঙ্গীতজ্ঞ সৌরিন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত (চুলু বাবু) এবং চট্টগ্রাম সঙ্গীত ভবনের কাবেরী সেনগুপ্তের বাবা প্রিয়দা রঞ্জন সেনগুপ্ত এই জলসায় গাইতে আসতেন। তবলা সঙ্গত করতেন শিবশঙ্কর মিত্র। চুলু বাবু চলিস্নশ দশকে নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে ধ্রুপদ, খেয়াল, সেতার বাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। বড় বড় ওস্তাদ তাকে খুব স্নেহ করতেন। ওই সময় আমার বাড়িতে এক আসরে অন্যদের গান শেষ হলে ওয়াহিদুল গলায় তুলে নেয় ফৈজ খাঁর খেয়াল আর খান সাহেব আবদুল করিম খাঁর ভৈরবী ঠুমরি– যমুনাকা তীর....। সবাই অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অনেক নবীন শিক্ষার্থী তার পায়ে ধরে প্রণাম করল। ওস্তাদ বেলায়েত আলী খাঁ, আগ্রা ঘরানার কিংবদন্তি শিল্পী। চট্টগ্রামে অনেকদিন ছিলেন। আমার মেয়েকে ক্লাসিক্যাল শেখাতেন। ওয়াহিদুলের অনুরোধে তাকে আমার বাড়িতে এক আসরে আমন্ত্রণ করে আনি। ওয়াহিদুলের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে জ্ঞানের গভীরতা দেখে তিনি দারুণভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তার গানের কোনো কোনো জায়গায় দুর্বল গায়কী ওয়াহিদুলের দৃষ্টিতে আসে। ওয়াহিদুল অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ওস্তাদজীকে সে কথাটি জানায়। ওস্তাদজী আমাকে বললেন, ওয়াহিদুল হক সাব বহুত গুণী

আদমি হ্যায়। আমি অনেকদিন পূর্ব পাকিস্তানে আছি, ওনার মতো কোনো গুণী লোক আমার নজরে আসেনি। ইনিতো সঙ্গীতের সাক্ষাৎ দেবতা।

ওয়াহিদুল ছিল বহুমাত্রিক বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী। সঙ্গীত, শিল্পকলা, সাংবাদিকতা, রাজনৈতিক বিশেৱষক, সঙ্গীত প্রশিক্ষক, সাহসী কলাম লেখক, দক্ষ সংগঠক। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীদের আমি তিনভাগে ভাগ করি। রবীন্দ্র মত্ত, রবীন্দ্র ভক্ত, রবীন্দ্রপ্রেমী। ওয়াহিদুল ছিল সত্যিকার রবীন্দ্রপ্রেমী। রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রবেশ করার হাজার দুয়ার। কিছু কিছু দুয়ার আছে যা সবার জন্য উন্মুক্ত নয়। যারা রবীন্দ্রনাথকে হৃদয়ে ধারণ করে তারাই ওই দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। ওয়াহিদুলের জন্য ছিল সেই দুয়ার অবারিত। মহাদেব সমুদ্র মন্থন করে অমৃত তুলেছিলেন। ওয়াহিদুল রবীন্দ্রনাথের গভীর সমুদ্র মন্থন করে রবীন্দ্র সুধা পান করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমার গানগুলো শুনলে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এই সুরগুলো কারো কাছে ধার করা নয়। কোথা থেকে এসেছে বলতে পারিনে। কিছু বাছ-বিচার, ভয়-ডর নেই। আপনার ইচ্ছামতো গলায় এসেছে, গেয়েছি, গান হয়ে উঠেছে। তাই ফিরে শুনি যখন বিস্মিত হই এবং নিজেকে বলি, এই রইল তোমার গান, যা কাল হরণ করতে পারবে না।"

রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ। আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত। ওয়াহিদুল মনে করত রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রবেশ করার মূল চাবিকাঠি তার গান। সে সারাজীবন রবীন্দ্রনাথের গানের তপস্যায় একজন ঋষি হয়ে উঠেছিল। গানের পরিপ্রেক্ষিত, রবীন্দ্র-ভাবনা সুন্দরভাবে বিশেৱষণ করে সে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম দিত। তার শুদ্ধ উচ্চারণ, নির্ভুল গায়কী এবং শেখানোর স্টাইল সত্যিই ঈর্ষণীয়। কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর রুচির নিম্নগামিতা সে সহ্য করতে পারত না। উভয় বাংলায় রবীন্দ্রনাথের গানকে আধুনিকীকরণের এবং হিন্দীকরণের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করেছে। বলেছে, রবীন্দ্রনাথের গানের ভুবন রবীন্দ্রনাথেরই থাক। তার কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, চিত্রকলা নিয়ে পৃথিবীর মানুষ যা খুশি তাই করুক। ওর গানের ওপর কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করার জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে গেছেন। এই গানই থাকুক বাঙালির আপন সম্পদ হয়ে। ওই গান দিয়েই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চিনি। এই গান দিয়ে আমরা বাঙালিত্বের বড়াই করি। তাই রবীন্দ্রনাথের গানকে বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দেয়ার ব্রত নিয়েছিল সে। সকলের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অগ্রাহ্য করে প্রবীণ বয়সে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে প্রতিভা খুঁজে বেরিয়েছে দেশের সর্বত্র। তাই আমরা বড়াই করে বলতে পারি ওপার বাংলার রবীন্দ্র চর্চার চেয়ে এপার বাংলার রবীন্দ্র চর্চা কোনোভাবেই পিছিয়ে নয়। ওপার বাংলায় রবীন্দ্রনাথকে ওরা পেয়েছে জন্মসূত্রে। আমরা রবীন্দ্রনাথকে সংগ্রামের মধ্যদিয়ে অর্জন করেছি।

যৌবনের প্রারম্ভে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই কামরুল হাসানের নেতৃত্বে মুকুল ফৌজের উদ্যোগে ব্রতচারী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন তাকে গুরুসদয় দত্তের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। দশটি ব্রতচারী সঙ্গীত তাকে বাঙালি জাতিসত্তার দিকে ধাবিত করে, তার মধ্যে 'বিশ্বমানব হবি যদি/ শাশ্বত বাঙালি হ' ছিল তার সবচেয়ে পছন্দের গান। শেষ বয়সেও সে মনে করত যদি ব্রতচারীর আদর্শে আমরা নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে পারি তাহলে বাঙালি তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে। স্বাধীনতার অর্জনগুলো আমরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারব। এই লক্ষ্যে সে প্রবীণ বয়সে ব্রতচারী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দারুণ উৎসাহী হয়ে ওঠে। আমাদের নিয়ে কাজও শুরু করে দেয়।

ওয়াহিদুলের জীবনের সবচেয়ে যে দিকগুলো আমাকে আকৃষ্ট করেছে, তাহলো তার বিজ্ঞানমনস্কতা, মূল্যবোধ ও যুক্তি বিচারে আপসহীনতা। বিজ্ঞানের ওপর এ দেশে তার বয়সের সতীর্থরা যখন কিছুই ভাবত না, শুধু মার্কসীজমের বাহ্যিক উন্মাদনা নিয়ে ব্যস্ত, সেই অল্প বয়সেই নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য সে বিজ্ঞান চর্চা শুরু করে। ওই বয়সেই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা ঔ.ই. ঐধষফড়হব -এর ১. ঝপরবহপব অফাধহপবং, ২. চড়ংংরনষব ডড়ৎষফ, ৩. ডযবহ ও ধস উবধফ; ঊাবৎুঃযরহম যধং ধ ঐরংঃড়ৎু; ঔ.উ. ইধৎহধষ -এর ঐরংঃড়ৎু ড়ভ ঝপরবহপব এবং কধৎষ গধথী -এর ঝবষবপঃবফ ডৎরঃরহমং রহ ঝড়পরড়ষড়মু ধহফ ঝড়পরধষ চযরষড়ংড়ঢ়যু (যে বইটি সে আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে বহু বছর আগে উপহার দিয়েছিল) ইত্যাদি গ্রন্থ সে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতো, আত্মস্থ করতো।

এই বিজ্ঞানমনস্কতার কারণে তার জ্ঞানের ব্যপ্তি ঘটে এবং প্রত্যেক জিনিসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে শেখে।

তার সচাইতে বড় কীর্তি ছায়ানট প্রতিষ্ঠা এবং রমনার বটমূলে পহেলা বৈশাখের প্রচলন। ১৯৬৭ সালে ওয়াহিদুল ও তার জীবনসঙ্গী সন্‌জীদা খাতুনের বিশেষ আগ্রহে এবং ছায়ানটের উদ্যোগে প্রচলন হয় পহেলা বৈশাখের। বাঙালি সংস্কৃতির হারানো উৎসবগুলোকে ফিরিয়ে আনার এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার এই উদ্যোগ কালে এটি একটি মহা উৎসবে পরিণত হয়। তার প্রভাব বাংলাদেশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ওইদিন লক্ষ লক্ষ নর-নারী বাঙালিত্বের গৌরবে সৌরভে আনন্দে আলোকিত হয়ে ওঠে, বিস্ফোরণ ঘটে– আমার সোনার বাংলা / আমি তোমায় ভালোবাসি গানটির।

১৯৬১ সালে গণমুখী দেশাত্মবোধক গানের প্রভায় দেশের মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্য নিয়ে ওয়াহিদুল, সন্‌জীদা খাতুন, সিধুভাই (বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মোখলেছুর রহমান), সাংবাদিক আহমদুর রহমানের উদ্যোগে গঠিত হয় ছায়ানট। মনে পড়ে, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপনের পর পরই অনেক তরুণ-তরুণী, শিল্পী-সাহিত্যিক, সঙ্গীতপ্রেমিকের একটি বড় দল জয়দেবপুরে পিকনিকে গিয়েছিলেন। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। ওখানে প্রগতিশীল গান এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল ছায়ানট। যা আজকে একটি বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। ধানমন্ডির লাল ইটে নির্মিত ছায়ানট ভবনটি ওয়াহিদুল হক এবং সন্‌জীদা খাতুনের হৃদয়ের নীলপদ্ম দিয়ে নির্মিত। যেখানে তার মরদেহ ফুলে ফুলে আচ্ছাদিত করে রাখা হয়েছিল। আর নানা বয়সী তার ভক্ত, বন্ধু এবং অসংখ্য ছাত্রছাত্রী অশ্রুসজল কণ্ঠে ২২টি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছিল। তার মধ্যে আগুনের

পরশমণি এবং সমুখে শান্তি পারাবার গান দু'টি সবার হৃদয় স্পর্শ করেছিল। ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছিল ছায়ানট ভবন। কান্নার রোল উঠেছিল, সকলের চোখ অশ্রুভেজা। আমার মনে হয়, বাংলাদেশে এবং ওপার বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া একমাত্র ওয়াহিদুলের মরদেহই এই সঙ্গীত বিজড়িত সম্মানের অধিকারী হয়েছে।

প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সন্‌জীদা খাতুনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে যখন সে কামরুল হাসানের মুকুল ফৌজের একটি অংশের দলনেতা। সে অংশে ছিল তার বন্ধু নূরুল কাদের, রফিকুল ইসলাম, আল মুতী শরফুদ্দীন, সাবের রেজা করিম ও শহীদ সাবের। উলেৰখ্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদী বক্তব্যের জন্য এক সময় সে মুকুল ফৌজ থেকে বহিষ্কৃত হয়।

এই মুকুল ফৌজের কার্যকলাপের সময় বই আদান-প্রদানের মাধ্যমে সন্‌জীদা খাতুনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সে পরিচয় পরবর্তীতে প্রণয়ে পরিণত হয়। সন্‌জীদা খাতুনের ভাষায়, "নবাব (সন্‌জীদার ভাই) যেমন ছিল ওয়াহিদুলে মুগ্ধ, নারগিসও (ওয়াহিদুলের বোন) তেমনি ছিল আমাতে মুগ্ধ। পরে আমি যখন বিনা নোটিশে পিত্রালয় ছেড়ে ওয়াহিদুলের মায়ের কাছে গিয়ে উঠেছিলাম (১৯৫৬), তখন আকস্মিক বিয়ের মালার ফুল ঐ নারগিসই তুলে এনেছিল সিভিল এভিয়েশনের কোয়ার্টার্স সংলগ্ন মাঠে ঘুরে ঘুরে। ভাঁটফুল। মার্চ মাসে এখনো যখন পথ চলতে হঠাৎ ঐ ফুলের গন্ধ পাই, তখন মনটা চমকে ওঠে। মেঠো ফুলের আয়োজন সেদিন যে রোমান্টিক আবহাওয়ার তৈরি করেছিল, তার ঘোর বোধ করি কাটবার নয়। জীবনটা যে কত বিচিত্র, কত বড়– তা জানতে জানতে চলে এলাম আধশতাব্দীরও এক দশক বেশি পথ। তবু, জীবন এখন পর্যন্ত ঐ চমকটুকুর হাত ছাড়াতে পারল না!"

ওয়াহিদুল ছিল জন্মবিদ্রোহী। সত্য ও সুন্দরের পূজারি। যা সত্য বলে গণ্য করত, যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করত তা নির্ভয়ে বলতে এবং লিখতে কোনোদিন দ্বন্দ্বে ভোগেনি। তার সেই সত্য ভাষণ অনেকে পছন্দ না করলেও সে তার মতামতে স্থির থাকত। কারো মন জুগিয়ে চলা তার চরিত্রের মধ্যে ছিল না। তার চরিত্রের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য দেখিনি।

জর্জ বার্নার্ড শ' ছিলেন এমনি চরিত্রের একজন মনীষী। মৃত্যুর আগে তিনি যে উইল করে গেছেন তাতে লেখা ছিল– ১. আমার মৃতদেহের একশ' গজের মধ্যে যেন কোনো ধর্মযাজক না আসে। ২. আমার মৃতদেহকে সামনে রেখে যেন কোনো ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা না হয়। ৩. আমার বই থেকে যে উপার্জন আসবে তা যেন কোনো ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত না হয়।

ওয়াহিদুল চিরকালই ছিল প্রথাবিরোধী। তাই তার মৃতদেহ কবরস্থ না করে তার দেহটি চিকিৎসা শাস্ত্রের গবেষণায় ব্যবহার করার জন্য দান করে গেছে। প্রথাগত আয়োজন বাদ দিয়ে তার ইচ্ছানুযায়ী গাওয়া হয়েছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত। তার কফিন অসংখ্য ফুলের স্তবক এবং মালায় মালায় ভরে গিয়েছিল।

বাঙালিদের মধ্যে ওয়াহিদুলই একমাত্র ব্যক্তি, যার ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে তার মৃত্যুতে। জীবনে যা চেয়েছিল, মরণেও তাই পেল, তার অনুরাগীদের তীব্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায়।

দৈনিক সমকাল, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

সিরাজুল ইসলাম সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কথা

সিরাজুল ইসলাম কখন আজিজ মিছির হয়ে গেল এবং কেন হয়ে গেল পরবর্তীকালে সিরাজের কাছ থেকে সেই কাহিনী শুনেছিলাম। সে বলেছিল, সিরাজুল ইসলাম নামটি ছিল প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। তাই এই নামটি বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ব্যবহার করতে আমার বিবেকে বাধে।

চট্টগ্রামে তার অবস্থান দীর্ঘদিনের। স্কুল জীবন কেটেছে চট্টগ্রামে। মাঝখানে চট্টগ্রাম ছেড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে যায়। সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাস করে।

১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামে সরকারি চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হয়। সে সময় আমার সংস্পর্শে আসে। সে ছিল ছাত্র ফেডারেশনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। তার বাবা রেল বিভাগে কর্মরত ছিলেন। রেলওয়ে ইনস্টিটিউট বা ওয়াজিউলৱাহ ইনস্টিটিউট ছিল প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি প্রাণকেন্দ্র। সেই সাংস্কৃতিক পরিবেশে সে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে আমি চট্টগ্রাম থেকে 'সীমান্ত' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা বের করি। এই পত্রিকায় উভয় বাংলার খ্যাতিমান লেখকরা লিখতেন। 'সীমান্ত'কে ঘিরে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক চর্চা শুরু হয় চট্টগ্রামে। আর ওয়াজিউলৱাহ ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নাট্য-আন্দোলন। সিরাজুল ইসলাম এই দুটি আন্দোলনের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। সীমান্ত পত্রিকায় তার ছোটগল্প প্রায় ছাপা হতো। 'সীমান্ত' ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। পাঁচ বছরে মোট আটচলিৱশটি সংখ্যা বেরিয়ে ছিল। বহুদিন পর মাত্র তেরটি সংখ্যা উদ্ধার করতে পেরেছি। তা 'সীমান্ত সংগ্রহ' নাম দিয়ে ২০০৫ সালে বের করা হয়। এর মধ্যে তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৭, সিরাজুল ইসলামের একটি অসাধারণ গল্প 'দু'তারা' খুঁজে পেলাম। সাধারণ মানুষকে নিয়ে গল্প লেখার আগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার মেধা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিজস্ব একটি স্টাইল ও ভাষা।

১৯৫৩ সালে ঢাকায় চলে আসার পর সে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং গল্প লেখা ছেড়ে দেয়। এতে আমি মর্মাহত হয়ে দেখা হলেই তাকে বকাবকি করতাম। সে বলত, আমি জীবনের মোহের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। ঢাকায় সে দৈনিক 'বাংলার বাণী' এবং দৈনিক 'মানবজমিনে' কৃতিত্বের সঙ্গে সাংবাদিকতা করে। আমাকে কেন এখনো একুশে পদক দেয়া হয়নি তা নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে বেশ কিছু ফিচার লেখে। এতে আমি বিব্রত বোধ করি।

১৯৫০ সালে আমরা চট্টগ্রামে 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠা করি। এই সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে সিরাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, মনে পড়ে। আমাদের সঙ্গে ছিল কলিম শরাফী, চিরঞ্জীব দাশশর্মা, অচিন্ত্য চক্রবর্তী এবং রমেশ শীল। প্রান্তি ক নবনাট্য সংঘ ১৯৫২ সালে কুমিলৱা সাংস্কৃতিক সম্মেলনে এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকায় কার্জন হলে সাহিত্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হয়েছিল।

১৯৫১ সালে চট্টগ্রাম প্রথম সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সে প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে। ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রুখবার জন্য আমরা 'শান্তি সম্মেলন' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলি। সেখানেও সে ফেস্টুন নিয়ে সম্প্রীতির মিছিলে দাঁড়িয়েছিল।

১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলায় সর্বপ্রথম আমরা 'বিশ্বশান্তি পরিষদ' গঠন করি এবং আণবিক বোমা নিষিদ্ধকরণের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠি। আণবিক বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রায় সাত লাখ স্বাক্ষর সংগ্রহ করি। এই স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে সিরাজ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ওই সময় ওয়াজিউলৱাহ ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে 'পরিচিতি' নামের ত্রৈমাসিক একটি সাহিত্য পত্রিকা বের হতো। যদ্দূর মনে পড়ে, সে ছিল সেই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য।

সবশেষে যে কথাটি না বললেই নয়, সে ছিল কমিউনিস্ট পার্টির একজন কার্ড হোল্ডার। চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে আহ্বায়ক করে যে গ্রুপ গঠন করে দিয়েছিল তার সদস্য ছিলেন শওকত ওসমান, এবনে গোলাম নবী, গোপাল বিশ্বাস এবং কৃষ্ণগোপাল সেন। সিরাজুল ইসলামের দায়িত্ববোধ, কর্মনিষ্ঠা, বিশ্বাসযোগ্যতা, মেধা এবং পার্টির প্রতি আনুগত্যের কথা বিবেচনা করে আমরা এই গ্রুপে তাকে অন্তর্ভুক্ত করি।

সিরাজের মৃত্যুতে দেশ একজন প্রতিভাবান ছোটগল্প লেখক, সাংবাদিক এবং দেশপ্রেমিককে হারিয়েছে।

আমি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, অবশেষে তার কীর্তিমান অনুজ প্রফেসর হারুন-উর-রশীদের উদ্যোগে সিরাজুল ইসলামের একটি গল্প সংকলন বেরোচ্ছে। ভূমিকা লিখেছেন বিশিষ্ট কবি, লেখক, গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ। তাদের আমি গভীরভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

১১ ডিসেম্বর ২০০৭

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী যখন স্কুলছাত্র, তখন আমার 'সীমান্ত' পত্রিকায় লাল কালি দিয়ে একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। সমাজবদলের আগ্রহে এই দ্রোহী কবিতাটি আমি 'সীমান্তে' ছাপিয়েছিলাম। তখন থেকে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ এবং পরবর্তীকালে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর সঙ্গে আমার একবার দেখা হয় আমাদের উভয়ের বন্ধু, নূরুল কাদেরের (ঝিলু) মতিঝিলস্থ অফিসে। তখন তার স্ত্রী আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ডাক্তাররা বললেন, এসেডিং প্যারালাইসিস, ৭২ ঘণ্টা বাঁচতে পারেন। মেডিক্যাল বোর্ড বসল। তারা বললেন, বিদেশে যেতে হবে। প্রথমে গেলেন কলকতায়, তারপর লন্ডনে। তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তারপরও কিছুক্ষণ চলল দেশের চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে, রাজনীতিতে মোশতাকের অবির্ভাব নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা, মনে পড়ে। উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত খায়রুল কবির। বহু বছর ধরে গাফ্‌ফার চৌধুরী লন্ডনে থাকেন, আমাদের দেখা হয় কদাচিৎ। কিন্তু একজন আরেকজনের অন্তরের বাইরে থাকি না। একই যাত্রার কমরেড যে ভাই আমরা দুজন।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। কোনোদিন কোনো ব্যাপারে, সংকটে-সংগ্রামে ভেঙে পড়তে দেখিনি। কিন্তু তার স্ত্রীর কঠিন পীড়ায় সেদিন তাকে দেখেছি একজন অসাধারণ প্রেমিক-পুরুষের চরিত্রে। আমার জীবনে অনেককে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন করতে দেখেছি। স্ত্রীর প্রেমিক হয়ে উঠতে দেখিনি। সেদিন তার স্ত্রী-প্রেমে অভিভূত হয়ে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর মধ্যে একজন প্রেমিক পুরুষকে আবিষ্কার করেছিলাম এবং তার কতর্ব্য জ্ঞানের প্রতি বিমুগ্ধ চিত্তে আলোড়িত হয়েছিলাম। এখনো স্ত্রীর প্রতি তার সেই প্রেম অটুট আছে।

তার একটি ছোটগল্প 'পাঁচজন মধ্যবয়সী পুরুষ' আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। এমন রোমান্টিক গল্প বাংলা সাহিত্যে খুব কমজনই লিখেছেন। গল্পটি হিউ নামের এক মধ্যবয়সী ইংরেজকে নিয়ে। মূর্তি বানানোই তার কাজ। নানা রকম মূর্তি– নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে। তার মধ্যে কার্ল মার্কস্, লেনিন থেকে শুরু করে, লেখকের ভাষায়– চার্চিলের মতো ঝুনো সাম্রাজ্যবাদীও আছেন। মূর্তি বানানো এবং বইয়ের মধ্যেই হিউ'র জীবন সীমাবদ্ধ। এই মূর্তি বানানোর বাইরে তার জীবনে কোনো নারীর আবির্ভাব হয়েছিল কিনা কেউ জানে না। একদিন হিউ'র কাছে সবাই জানতে চাইল, তার জীবন নারীশূন্য কেনো। হিউ তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলেছিল, আমার জীবনে নারী নেই অথবা আমি নারী সাহচর্য থেকে বঞ্চিত এ কথা তোমাদের কে বলল। আমার প্রেমিকা মেয়েটি সব সময় আমার বেডরুমে থাকে। বিশ্বাস না হয় আমার সঙ্গে এসো। তার সঙ্গে বেডরুমে সবাই গিয়ে দাঁড়াল। সবার চোখে পড়ল একটি লাইফ-সাইজ মূর্তি। বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ। চোখের উপর লুটিয়ে পড়া ঈষৎ ধূসর রঙের চুল। শিশুর মতো সরল হাসি ঠোঁটে। লেখকের ভাষায়, এমন জীবন্ত মূর্তি আমি কখনো দেখিনি– মাদাম তুসোতেও নয়। মনে হলো মেয়েটি এখনি সশব্দে হেসে উঠে আমাদের হ্যালো বলবে।

হিউ বললেন, ওই যে উত্তরের বন্ধ জানালাটা দেখছ, ওই জানালা খুললেই রাস্তার ওপারে একটা ফ্ল্যাট বাড়ি দেখবে। ওরই একটা ফ্ল্যাটে প্যাট্রিসিয়া তার এক বান্ধবীর সঙ্গে থাকত। বছর দুয়েক আগের কথা। ওই জানালার পর্দা সরালেই প্যাট্রিসিয়াকে দেখতাম। চিরকাল আমার মূর্তি নিয়ে কারবার। এই প্রথম একজন জীবন্ত মানবীকে ভালোবাসলাম। কিন্তু আমাদের বয়সের পার্থক্যের কথা ভেবে ওর সঙ্গে পরিচয় করা থেকে বিরত রইলাম।

হিউ বলেন, আমি মনে মনে প্যাট্রিসিয়ার প্রেমে পড়লাম এবং তাকে নিয়ে ফ্যান্টাসির রাজ্যে বাস করতে লাগলাম। কিন্তু সে আমাকে অবাক করে দিয়ে নিজেই একদিন পরিচয় করতে এগিয়ে এলো। বলল, আমি শুনেছি, তুমি অনেক সুন্দর সুন্দর স্ট্যাচু বানিয়েছ। আমি একটু দেখতে চাই। তাকে আমার তৈরি স্ট্যাচু মূর্তি সব ঘুরিয়ে দেখালাম। সে মুগ্ধ, বিমোহিত হয়ে দেখল। বলল, ওয়ান্ডারফুল। আমি মাঝে মাঝে তোমার কাজ দেখতে আসতে পারি? বিশেষ করে যখন তুমি মূর্তি বানাতে থাক! কোন ঘরে তুমি মূর্তি বানাও?

তাকে আমার স্টাডি এবং ওয়ার্কশপ দেখালাম। সে তারপর প্রায়ই আমার কাছে আসতে শুরু করল। একদিন আমি যখন ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি নিয়ে কাজ করছি, তখন হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে, গালে চুমু খেয়ে বলল: আই লাভ ইউ। ওহ্ আই য়্যাম সো ফন্ড অব ইউ। বললাম, প্যাট্রিসিয়া, আমাদের এজ গ্যাপ– বয়সের ব্যবধানের কথা ভেবেছ? প্যাট্রিসিয়া বলল: বয়স বন্ধুত্বের পথে কোনো বাধাই নয়।

একটু থেমে হিউ বলল, বছরখানেক পর যখন আমাদের বন্ধুত্ব আরেকটু পাকা হলো, তখন ওকে একদিন চুমো খেতে গেলাম ঠোঁটে। প্যাট্রিসিয়া ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে বলল, উহ্ ঠোঁটে নয়। ঠোঁট আমার ফিঁয়াসের জন্য বরাদ্দ। তুমি আমার গালে চুমু খেতে পারো। তোমাকে দেখায় আমার বাবার মতো।

প্যাট্রিসিয়া শেষবার যখন আমার ঘরে এলো, তখন সে এনগেজড। একজন আমেরিকান ছেলেকে বিয়ে করছে। আমাকে শেষ দিকে বলেছিল, তাকে সে বহুদিন থেকে ভালোবাসে। সে ইংরেজ মেয়ে। ছেলেটি আমেরিকান। আমি তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছি। প্যাট্রিসিয়া বলেছে, তুমি আমাকে মিস করবে জানি। তবু তুমি সুখে থাক, এই কামনা জানাতে এসেছি।

আমার মনে হলো, প্যাট্রিসিয়াকে যতই সরল ও শিশু মনে হয়, তা সে নয়। তার কণ্ঠে আন্তরিকতার বদলে কপটতা টের পেলাম। মনে হলো, সে আমাকে মৃদু ব্যঙ্গ করছে। বলছে, বুড়ো তোমাকে কিছুদিন নাচিয়ে আমি এখন বিদায় নিচ্ছি। এখন ঘরে বসে তুমি শুধু হাপিত্যশ করো, কী মজা! কিন্তু আমি তাকে মজা উপভোগ করতে দিলাম না। বললাম, প্যাট্রিসিয়া, তোমার এখন

বিয়ে। তুমি একদিন মা হবে, বুড়িও হবে। কিন্তু যে প্যাট্রিসিয়াকে আমি ভালোবাসি, সে কিন্তু কোনোদিন মা হবে না, বুড়িও হবে না। আমাকে বুড়ো বলে গাল দিয়ে পালাবে না। তাকে তুমি দেখতে চাও? প্যাট্রিসিয়া বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, কই দেখাও তো।

হিউ এবার থামল। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল: সেদিন তোমাদের মতোই বেডরুমের দরোজা খুলে ওকে এই মূর্তিটা দেখিয়েছি। ততদিনে মূর্তিটা তৈরি হয়ে গেছে। প্যাট্রিসিয়া কিছুটা হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ মূর্তিটার দিকে চেয়ে থেকে দৌড়ে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গালে মুখে চুমো খেতে খেতে বলছে, আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ। তারপর বুকের মধ্যে ব্যথা রেখে প্রশ্ন করেছে : তুমি এখন কাকে বেশি ভালোবাসো? আমাকে? না ওই মূর্তিটাকে?

আমি কঠিন কণ্ঠে জবাব দিয়েছি, মূর্তিটাকে। তুমি আমার নও। কিন্তু মূর্তি প্যাট্রিসিয়া আমার।

গল্প শেষ করে হিউ তার স্কচ হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিল। বলল : প্যাট্রিসিয়াকে সেই প্রথম আমি কাঁদতে দেখেছি।

গল্পের কী বিস্ময়কর সমাপ্তি! গল্পটি বহু আগে লেখা। কিন্তু মনে হয় এখনো আধুনিক, তরতাজা। এই গল্প থেকে এত বড় উদ্ধৃতি দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য– আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী আসলে কত বড়মাপের সাহিত্যিক তা দেখানো। কবিতা দিয়ে তার সাহিত্য জীবনের শুরু। 'ভয়ঙ্করের হাতছানি', 'ডানপিঠে শওকত' দুটি উপন্যাস ছাড়াও 'কৃষ্ণপক্ষ', 'সম্রাটের ছবি', 'সুন্দর হে সুন্দর', 'জীবন থেকে নেয়া', 'কীর্তনখোলা এবং অন্যান্য' নামের পাঁচটি ছোট গল্পগ্রন্থ, ইতিহাস নির্ভরগ্রন্থ 'ইতিহাসের রক্তপলাশ : পনেরই আগস্ট পঁচাত্তর', মুক্তিযুদ্ধের ওপর 'বাঙালির অসমাপ্ত যুদ্ধ', স্মৃতিচারণমূলক 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা' তিনি লিখেছেন।

তার ভাষা সাবলীল, স্বচ্ছ। শব্দ চয়নে অসম্ভব সতর্ক, কাহিনী নির্মাণের কৌশল বিস্ময়কর। তার গদ্যশৈলী এমন চমৎকার এবং আকর্ষণীয়, একবার পড়া শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায় না। তার এই গ্রন্থসমূহ পড়লে বাংলাদেশের পাঁচ দশকের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক জীবনের অনেক চিত্র ও চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পরিতাপের বিষয় তার সৃষ্টিশীল এসব কাজের এখনো পর্যন্ত কোনো মূল্যায়ন হয়নি। মূলত তিনি কলাম লেখক হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। বাংলা ভাষাভাষী এমন কেউ নেই যিনি আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর কলাম পড়েননি। কলাম লেখায় তার জ্ঞানের পরিধি যেমন জানা যায়, তেমনি উপলব্ধি করা যায় তার চিন্তা শক্তির গভীরতা। তার তথ্য ভাণ্ডার যেমন সমৃদ্ধ, ইতিহাস চেতনাও গভীর ও অন্তর্ভেদী। দেশের সাম্প্রতিক কোনো ঘটনা তার দৃষ্টি এড়ায় না। প্রতিটি ঘটনা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বিশেস্নষণ করে অসম্ভব পারদর্শীতায় তিনি পাঠকের কাছে তুলে ধরেন। আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলোও তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে তার কলামে উপস্থিত হয়। তিনি দৃঢ়চেতা এবং আদর্শের ক্ষেত্রে আপসহীন এক কীর্তিমান পুরুষ। তার স্পেকুলেটিভ লেখা পাঠককে খুবই টানে। অবশ্য কখনো কখনো এজন্য তিনি লাঞ্ছনার শিকারও হন। কলকাতায় এ ধরনের একটি স্পেকুলেটিভ লেখার জন্য মোশতাকপন্থী কয়েকজন ছাত্রনেতা তাকে মারতে এসেছিল। ওই লেখায় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। বহুবার তিনি বিতর্কিত হয়েছেন, সরাসরি আক্রমণের শিকার হয়েছেন, বহুবার তার চরিত্র হনন করা হয়েছে। কিন্তু কখনোই অন্যায়ের কাছে মাথানত করেননি। কোনোদিন রাজবন্দনা করতে তাকে দেখিনি। সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণজাগরণ অব্যাহত রাখার যে পরামর্শ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে চৌদ্দ দলকে দিয়েছেন, আমরা ইতোমধ্যে তা ফলবতী হয়ে উঠতে দেখছি।

ধানমন্ডিতে তার স্ত্রীর নামে একখণ্ড জমি আছে। এক পার্টিতে তার একজন বন্ধু তাকে ওই জমিতে ছয়তলা বাড়ি করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জমিটা ফেলে রেখেছেন কেন? ওই জমিতে ছয়তলা একটি বাড়ি করুন, একটা ফ্লোর নিজের জন্য রেখে বাকি সব ভাড়া দেবেন। এক লাখ দেড় লাখ টাকা ভাড়া পাবেন, ঢাকার জমি তো নয় কাঁচা সোনা। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, বাড়ি করার অত টাকা আমি পাব কোথায়। বন্ধু বললেন, আপনাকে আগেই বলেছি একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। অনুরোধটুকু আপনি রাখুন বাড়ি করার টাকার অভাব হবে না। এ প্রসঙ্গে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এভাবে : 'বঙ্গবন্ধু হাসি ঠাট্টার মুডে থাকলে বলতেন গরিবের বৌ যদি সুন্দরী হয়, তাহলে সকলেই ভাউজ (ভাবী) ডাকে।' আজ বঙ্গবন্ধু নেই, মাঝে মাঝে মনে হয় কথাটা আমার বেলাতেও সত্য। আমার সৌন্দর্য নেই, আছে লেখার সামান্য ক্ষমতা। যখনই এই সামান্য ক্ষমতা নিয়ে দু-একছত্র সত্য কথা লিখতে চাই, তখনই সামনে খাড়া হয় ভীতি, না হয় প্রলোভন। প্রলোভনটাই আগে আসে। কারণ সকলেই ভাবেন, একজন গরিব সাংবাদিকের মাথার দাম আর কত হতে পারে। তাছাড়া আমাদের দেশের মতো দেশে উত্তরা, বারিধারায় একটা জমির পস্নট, বাড়ি বানানোর টাকা, দু-একটা লাইসেন্স পারমিট বা বিদেশে একটি চাকরির অফারের বিনিময়ে সাংবাদিকের সতীত্ব বিসর্জনের উদাহরণতো খুব খুঁজে বেড়াতে হয় না। সুতরাং প্রলোভন যারা দেখান বা সকল সাংবাদিককেই যারা একই মানদণ্ডে মাপতে চান, তাদের দোষ দেই না।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর চরিত্র হননের জন্য বলা হয়ে থাকে তিনি আর্থিক লোভ-লালসার উর্ধ্বে নন। আমি উপরের যে ঘটনা উলেস্নখ করলাম এবং পরবর্তীতে আমি যে কয়েকটা ঘটনার সাক্ষী তাতে উপলব্ধি করেছি তিনি সত্যি সত্যিই প্রলোভনের উর্ধ্বে, অর্থের কাছে মাথানাত করেননি। লন্ডনে অসুস্থ স্ত্রী পরিবার নিয়ে বাস করা খুবই ব্যয়বহুল। তিনি ওখানে স্কুলে চাকরি করেন এবং কলাম লিখে জীবিকা নির্বাহ করেন। এটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং পরিশ্রমের কাজ। যদি তিনি কোনো স্বৈরাচারী শাসকের কাছে মাথানত করতেন গুলশান-বারিধারায় পস্নট পাওয়া তার জন্য খুবই সহজ ছিল। এই পস্নট অনেকের মতো কয়েক কোটি টাকা বিক্রি করে তিনি অনায়াসে জীবনযাপন করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি।

১৯৪৮ সালে যখন তিনি বরিশালে স্কুলের ছাত্র, তখন থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামের সঙ্গে সংশিস্নষ্ট ছিলেন। ওই সালের ১১ মার্চ তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ভাষা আন্দোলন করার অপরাধে, স্কুলে ধর্মঘট পালনের কারণে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি

রক্তাক্ত ঘটনার মিছিলে তিনি শরিক হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ করেছিলেন বরকত-সালামের গুলিবিদ্ধ লাশ। তার বুকজুড়ে ছিল দেশপ্রেমের আগুন। সে চেতনায় বিদ্ধ হয়ে তিনি লিখেছিলেন সেই অবিস্মরণীয় গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। এ গানটি লিখে তিনি ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছেন। তাকে স্পর্শ না করে কেউ শহীদ মিনারে ফুল দিতে যেতে পারবে না।

একুশ নিয়ে এখনো তার ক্ষোভের অন্ত নেই। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' এই গানটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন– আমরা একুশকে স্মৃতি করে ফেলেছি। একটা উৎসব হিসেবে তা উদযাপন করি। একুশকে একটা জীবনশক্তি হিসেবে আমরা ধারণ করিনি। একুশের যে প্রাণ, একুশের যে শক্তি, একুশের যে উদ্দীপনা, একুশের যে রক্তদান তা যদি আমাদের মনে বজায় থাকত তাহলে হয়তো বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতি, বাংলা নাটক, বাংলা গান আজকে আরো দুর্জয় তেজে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ত। একুশকে আমরা স্মৃতি করে ফেলার জন্যেই আমাদের পদস্খলন হয়েছে। যার ফলে বাংলা ভাষা আজকে আবার নানাভাবে অপসংস্কৃতি ও অপপ্রচারের শিকার হচ্ছে।

বর্তমানে লন্ডনপ্রবাসী আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ১৯৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বর বরিশালের উলানিয়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বাসে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একজন সমাজতন্ত্রী। পেশায় সাংবাদিক এবং মননে একজন সৃষ্টিশীল কথাশিল্পী। বয়সে তিনি আমার সাত বছরের ছোট। কিন্তু দু'জনেই একই বেদনার কমরেড। তার জন্মদিনে আমার অশেষ শুভেচ্ছা। আমার বন্ধু আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী সুস্বাস্থ্য নিয়ে শতায়ু হোন। জয়তু আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী।

দৈনিক সমকাল, ১২ ডিসেম্বর ২০০৬

সাহসী নাট্যকার আতিকুল হক চৌধুরীর মতো আমরা সবাই এখন অবরুদ্ধ

যতদূর মনে করতে পারছি নাট্যকার, নাট্য পরিচালক আতিকুল হক চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৬৪ কি ১৯৬৫ সালে। সবেমাত্র তিনি রেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে রেডিও পাকিস্তান চট্টগ্রামে বদলি হয়ে এসেছেন নাটকের প্রোগ্রাম অর্গানাইজার হিসেবে। তৎকালীন চট্টগ্রাম বেতারের প্রযোজক (শ্রদ্ধেয় আবুল ফজলের ছেলে) মঞ্জুরের রুমে অথবা অন্য কোনো প্রযোজকের রুমে আতিকুল হক চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আমার নাম শুনে বললেন-, "আপনিই সেই মাহবুব উল আলম চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের টিয়ার গ্যাসের মধ্যে যার কবিতা পড়েছিলাম 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'। আপনার কবিতা পড়ে মনে হচ্ছিল আমরা যারা আমাদের কথা, মনের কথা প্রকাশ করতে পারছিলাম না, আপনি তা প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং গোটা জাতিকে সেই কবিতা দিয়ে উজ্জীবিত করেছেন। দুঃখ লাগে, এই কথা মনে করে আপনার লেখা কবিতাটির ছাপানো কপি আমি আমার বুক পকেটে রেখেছিলাম, পরবর্তী পর্যায়ে কবিতাটি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমার মনের পকেটে সেই কবিতা এখনো আছে। চিরদিন থাকবে। শ্রদ্ধেয় আবুল ফজল সাহেবও বসা ছিলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি তার স্বভাবসুলভ রসিকতার সঙ্গে আতিক সাহেবকে বললেন-, 'আমরা তো মফস্বলের মানুষ, আপনার নাটকের রস ঠিকই আস্বাদন করতে পারি। কিন্তু আপনার নাটকে রসের সঙ্গে যে কষেরও সমাবেশ থাকে তা কি শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাবসম্পন্ন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা গ্রহণ করতে পারেন? যতদূর মনে পড়ে, আতিক সাহেব আবুল ফজল সাহেবকে বলেছিলেন, "আমি নাটক লিখি ও নাটক করি দেশের মানুষের জন্য। রস বিতরণ করার জন্যও নয়– কষ বিতরণের জন্যও নয়।" আবুল ফজল সাহেব বলেছিলেন, "আর যাইহোক আপনার নাটকে একটা কমিটমেন্ট থাকে– এটা রাখতে চেষ্টা করবেন। আমিও বোধ হয় আতিকুল হক চৌধুরীকে তখন বলেছিলাম, "যে পথে আপনি চলছেন সেখান থেকে এক পাও সরে যাবেন না– আমারও এই অনুরোধ।"

তখন ছিল ষাটের দশক। আজ ২০০৬ সাল। কর্ণফুলী ও বুড়িগঙ্গায় অনেক স্রোত বয়ে গেছে। আতিকুল হক চৌধুরী রেডিও পাকিস্তান থেকে রেডিও বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পাঁচ বছর। তারপর পাকিস্তান টিভি কর্পোরেশনে, পরবর্তী পর্যায়ে বিটিভিতে। সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক ও নাটকতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকতা শেষ করে বর্তমানে একুশে টিভির পরিচালক (অনুষ্ঠান) হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

তবে এ কথা বলতে আমার ভালো লাগছে যে, এই কয়েক যুগেও এই সাহসী নাট্যকার আতিকুল হক চৌধুরী তার অঙ্গীকার থেকে একচুল পরিমাণও সরে আসেননি– একটুকুও না। বাধা এসেছে, প্রতিকূলতা এসেছে, সরকারি রোষানলে পড়েছেন– চাকরি হারাবার উপক্রমও হয়েছে অনেকবার। কিন্তু তার জায়গা থেকে তিনি নড়েননি এতটুকু। হয়তো কৌশল বদলেছেন। কিন্তু নিজ অবস্থান থেকে সরেননি। চট্টগ্রামে তিনি রেডিওতে বোধহয় বছরখানেক ছিলেন। আমাকে চট্টগ্রাম বেতারে অনুষ্ঠান করতে অনেক অনুরোধ করেছেন তিনি। কিন্তু পারেননি। কারণ আমি সরকারের কালো তালিকাভুক্ত ছিলাম। সরকার আমার পাসপোর্ট জব্দ করেছিল। ১৯ বছর পাকিস্তানি সরকার আমাকে পাসপোর্ট দেয়নি। বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও রমেশ শীল যখন মারা গেলেন তখন রমেশ শীল সম্পর্কে কথা বলার আর কাউকে খুঁজে না পেয়ে তিনি সাহস করে রমেশ শীলের ওপর আমার বক্তব্য বেতারে প্রচার করেছিলেন। এটা ছিল তার পক্ষে একটি মারাত্মক ঝুঁকি। একে তো প্রবাদপ্রতিম রমেশ শীল সরকারের সুনজরে ছিলেন না। অন্যদিকে আমি হলাম সরকারের কালো তালিকাভুক্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি। আমি জানি না রমেশ শীলের ওপর আমার বক্তব্য বেতারে প্রচার করে তিনি কী করে চাকরি রক্ষা করতে পেরেছিলেন। আমার অপরাধ আমি সমাজতন্ত্রের পক্ষে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, বিশ্বমানবতার পক্ষে কাজ করেছি, কাজ করেছি বিশ্বশান্তির পক্ষে।

আতিকুল হক চৌধুরীর অনেক কালজয়ী নাটক আমি বেতারে শুনেছি, টিভিতে দেখেছি। যতদূর মনে পড়ে, তার অন্যতম দুটি নাটক 'ক্রীতদাসের হাসি' ও 'বাবার কলম কোথায়'। প্রথমটির জন্য পাকিস্তান সরকারের এবং দ্বিতীয়টি 'বাবার কলম কোথায়'-এর জন্য বাংলাদেশে তৎকালীন মিলিটারি কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়েছিলেন। তাকে নানাভাবে জানানো হয়েছিল যে এ ধরনের নাটক তিনি যেন আর না করেন। আতিকুল হক চৌধুরী কিছুটা আপস করে কিংবা নাটকীয় কৌশল অবলম্বন করে তার পরবর্তী নাটকগুলোতে কিছুটা রোমান্টিকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই রোমান্টিকতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সমাজ পরিবর্তনের কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। কেউ বুঝেছেন, কেউ বোঝেননি, আবার কেউ বুঝতে চাননি।

আতিকুল হক চৌধুরীর সব উলেৱখযোগ্য নাটক আমি দেখেছি এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারব না। তবে তার নিজের লেখা নাটকগুলো যেমন 'দূরবীণ দিয়ে দেখুন', 'বাবার কলম কোথায়', 'নীল নকশার সন্ধানে', 'আর কতদূর'-এর মতো অনেক নাটক দেখেছি। যা দেখে আমার মনে হয়েছে তিনি শুধু একজন সমাজ সচেতন নাট্যকার নন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণের পক্ষের লোক। যিনি পুঁজিবাদে বিশ্বাস করেন না। তার মধ্যে সমাজতন্ত্র ও মানবতাবাদের মেল-বন্ধন আছে, সেখানে মানবতার কল্যাণে ধর্ম সচেতনতাও অনুপস্থিত নয়। বোধকরি সে জন্যই তিনি রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয়ের গল্পগুলোর এত সার্থক নাট্যরূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। এই মুহূর্তে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় তার পরিচালিত একটি নাটকের কথা মনে হচ্ছে– যেখানে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা টানা দু'দিন অভুক্ত থেকে একটি কবরের মধ্যে আটকা পড়েছিলেন। নাটকটির নাম ছিল বোধকরি 'অবরুদ্ধ'। আমরাও আতিকুল হক চৌধুরীর মতো সমাজ সচেতন নাট্যকার, কবি, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ববৃন্দ সমাজ জীবনের এই নিদারুণ কঠিন সময়ে কি অবরুদ্ধ নই? আগামী দিনগুলো আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেবে। আতিকুল হক চৌধুরী আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। তবু তাকে আমার চলার পথের একজন সুহৃদ ও সাথী ভাবতে আনন্দ অনুভব করি। তার জন্মদিনে তাকে আমার প্রাণঢালা ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শতায়ু হোন।

দৈনিক সংবাদ, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৬

ফুলের নামে নাম– শিমূল
শিমূল ইউসুফের উদ্দেশ্যে

ফুলের নামে নাম– শিমূল। বসন্তকালের ফুল। ফেব্রুয়ারি মাসে শহীদের রক্তে পূর্ব দিগন্ত যখন লাল হয়ে ওঠে পলাশ আর শিমূলের স্পর্ধিত লালিমায়, তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিমূল নামটি আমাকে বড্ড টানে।

তার বয়স যখন সাত কি আট তখন প্রফেসর অজিত গুহ ও প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহীমের সঙ্গে সে চট্টগ্রাম গিয়েছিল। তাঁরা উঠেছিলেন বাঁশপাড়া চৌধুরী বাড়ি বিনোদদার বাড়িতে। একদিন আমাদের বাড়িতে তাদের খেতে ডেকেছিলাম। ওই সময় শিমূল সাতটি কি আটটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। সেদিন তার কণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণ, চমৎকার গায়ন-ভঙ্গি এবং কণ্ঠশীলনে পরিশীলিত যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল একদিন এই শিল্পী রবীন্দ্রসঙ্গীতে দেশ মাতিয়ে তুলবে। আমার ধারণা মিথ্যে হয়নি। শিমূল বর্তমানে শুধু জনপ্রিয়তার দিক থেকে নয়, অনন্য অভিনয় নিপুণতার কারণে আকাশের সীমানা লঙ্ঘন করতে চলেছে। একজন শিল্পীর মধ্যে এতগুলো গুণের সমাবেশ কদাচিৎ দেখা যায়। একের মধ্যে যেন অনেক। একজন গুণী শিল্পী হতে হলে যে সমস্ত উপাদান শিল্পীর চরিত্রে থাকতে হয়, সবই আছে শিমূলের চরিত্রে, তার জীবনে। রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার পাশাপাশি সে নজরুলের গান আত্মস্থ করেছে। দাপটের সঙ্গে গণসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত গেয়ে বেড়িয়েছে। সঙ্গীতে যেমন রয়েছে তার অসাধারণ পারদর্শিতা তেমনি মঞ্চনাটক থেকে শুরু করে টিভি নাটক, কোরিওগ্রাফি, সঙ্গীত, নৃত্য, পোশাক পরিকল্পনা, নাট্য নির্দেশনা, সঙ্গীত পরিচালনা– সব মিলিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ তার কর্মময় জীবন। পৃথিবীতে কিছুই শূন্য থেকে আসে না। সব শিল্পকর্ম আয়াস সাধ্য সাধনা। প্রত্যেকটি অর্জনের পেছনে থাকে শিল্পীর ধৈর্য এবং নিয়মিত অনুশীলন। ছোটবেলা থেকে সে সঙ্গীতে তালিম নেয় ওস্তাদ হেলাল উদ্দিন, শেখ লুৎফর রহমান, পি সি গোমেজ, ওস্তাদ ফুল মোহাম্মদ, শহীদ আলতাফ মাহমুদ, আবদুল লতিফ, ওস্তাদ ইমাম উদ্দীন, এবং সুধীন দাশের কাছে। তেমনি নাটকে অসীম নিষ্ঠা এবং সাধনার মধ্যদিয়ে সে হয়ে উঠেছে এ যুগের একজন 'ফ্লাওয়ার অব দ্য স্টেজ'। তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে কবি সুফিয়া কামাল বলেছিলেন- "সময়ের তরঙ্গায়িত সাম্পান ধরে শিমূলের সুর ও সঙ্গীত কলেৰ্বালিত করেছে আমাদের সমগ্র জনপদ। শিমূলের অভিনয়ের দ্যুতিতে আলোকিত আজ আমাদের মঞ্চ। তার সঙ্গীত ও অভিনয়ের দ্বৈত সত্তার অভিন্ন উপস্থিতি শিল্পের জমিনে নতুন ফসল। আমি শিমূলকে আনন্দচিত্তে 'মঞ্চকুসুম' নামে অভিষিক্ত করছি।" সেই থেকে আমাদের শিমূল রূপান্তরিত হলো মঞ্চকুসুমে। মঞ্চের সেই কুসুম পঁয়তালিৰ্শ বছর ধরে তার অভিনয়ের দীপ্তিতে চারিদিক উজ্জ্বল করে রেখেছে এবং মঞ্চকে করে তুলেছে আরাধনার তীর্থ।

এই সেদিন (একুশে মার্চ ২০০৭) জাতীয় নাট্যমঞ্চে পঞ্চাশ বছর বয়সেও শিমূল দাপটের সঙ্গে নেচেগেয়ে, বিভিন্ন কণ্ঠস্বরে বিনোদিনী নাটকের একক অভিনয়ে যে নৈপুণ্য দেখাল তা আমাদের নাট্য জগতে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। এই মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে সে দেশের সীমান্ত পেরিয়ে পরিচিতি লাভ করেছে বহির্বিশ্বে। আজকালকার দর্শক নটী বিনোদিনীকে চেনে না। এক সময় অসাধারণ অভিনয় প্রতিভার কারণে বিনোদিনীর স্থান ছিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে। ফ্লাওয়ার অব দ্য নেটিভ স্টেজ, মুন অব দ্য স্টার কোম্পানি, প্রিমা ডোনা অব দ্য বেঙ্গলি স্টেজ– উনিশ শতকের শেষের দিকে অসংখ্য পত্রপত্রিকায় এসব বিশেষণে ভূষিত করা হতো তাঁকে। সেই বিনোদিনী যখন কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে বসেছে, বিশেষ করে এপার বাংলায়। তখন শিমূল সেই মৃত কঙ্কালকে মঞ্চে এনে তার শরীরে অস্থি, মাংস, রক্ত সংযোজন করে বিনোদিনীকে প্রাণবন্ত করে তুললো অমর-জ্যোতির মতো। যার স্পর্শে মৃত মানুষ কথা বলে ওঠে।

বিনোদিনী বিধৃত স্মৃতিকথা লিখিত হয়েছিল সাধুভাষায়। সেখানে তার ব্যক্তি জীবন, অভিনয় জীবন, ব্যক্তিসত্তার নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ দিক এবং সেই সময়কার বিশেষ সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরেছিলেন তিনি। সেই স্মৃতিকথায় তার জীবনের প্রেমিক, প্রেম, প্রতারণা– সবকিছু তিনি তুলে ধরেছেন। থিয়েটারকে তিনি এত ভালোবাসতেন যে একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ তৈরির জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কীভাবে একজন ধনী অবাঙালির রক্ষিতা হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, সে কথাও তিনি সাহসের সঙ্গে এই জীবন স্মৃতিতে উলেৰ্খ করেছেন। কথা ছিল রঙ্গমঞ্চটি তার নামে নামকরণ করা হবে। কিন্তু কিভাবে প্রতারণার মাধ্যমে তার নাম বাদ দিয়ে তাকে সেই সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, সেই বেদনার কথাও তিনি লিখেছেন। বিনোদিনী অভিনয় শুরু করে মাত্র বারো বছর বয়সে। তার অভিনয় জীবনের ব্যাপ্তি মাত্র বারো বছর। এই সময়কালে তিনি আশিটি নাটকে নব্বইটির মতো চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে নীলদর্পণ, মেঘনাদবধ, মৃণালিনী, চৈতন্যলীলা অন্যতম। আমার আশ্চর্য লাগে যে, শিমূল একক অভিনয়ের মধ্যদিয়ে কী করে বিনোদিনী অভিনীত এতগুলো নাটকের বিশেষ বিশেষ অংশ কখনো নৃত্য সহযোগে, কখনো গান গেয়ে, কখনো কণ্ঠস্বর বদলিয়ে প্রত্যেকটি চরিত্রকে জীবন্ত করে তুললো। আমার মনে হয়েছিল, যেসব নাটকের বিশেষ বিশেষ চরিত্রে সে অভিনয় করে দেখাল তারা সবাই রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে সেদিন মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল। সেদিন তার অভিনয়সত্তা– সঙ্গীত ও নৃত্য সত্তার সঙ্গে মিশে তার চোখেমুখে, পায়ে, শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কথামালা হয়ে ফুটে উঠেছিল। মানুষের যে লোভ-লালসা, প্রতারণা, কৃতঘ্নতা, বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতা বিনোদিনীর জীবনকে চির দুঃখময় করে তুলেছিল, শিমূলের অভিনয়ে জীবনযুদ্ধে পরাস্ত, পর্যুদস্ত, অভিমানে ভেঙে নুয়ে পড়া সেই কিংবদন্তি অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বরই যেন আমরা শুনতে পেলাম। কিছু না পাওয়ার বেদনায় বিপর্যস্ত জীবন থেকে কঠোর পরিশ্রম এবং সাধনার বলে যে অভিনেত্রী নিজেকে তুলে

এনেছিলেন অনেক পাওয়ার জগতে এবং যে অভিনেত্রী জীবনে সব পেয়েও কিছুই যে পেল না, বিনোদিনীর জীবনের সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাত শিমূল অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে দর্শকের সামনে তুলে ধরেছিল সেদিন।

অভিনয়কে যে নারী ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়ার উপরে স্থান দিয়েছিলেন, নাট্যকলাকে শুধুমাত্র জীবিকা না ভেবে শিল্পকলার চরম উৎকর্ষে পৌঁছে দিয়েছিলেন, একদিন বুকভরা ব্যথা আর বঞ্চনার বোঝা মাথায় নিয়ে সে নারীকে চিরবিদায় নিতে হয়েছিল অভিনয় জগৎ থেকে। শিমূলের কৃতিত্ব, বিনোদিনীর সেই ব্যথা-বেদনাকে তার নাট্য প্রতিভার দ্বারা দর্শক শ্রেণীর ব্যথা-বেদনায় পরিণত করেছিল।

পুরুষতন্ত্রের যে অবিচার, লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন বিনোদিনী, তার গুরু গিরিশচন্দ্রের পরামর্শে তিনি তার প্রতিবাদ করতে পারেননি। শিমূলের সফলতা, সে একশ' ত্রিশ বছর পরে বিনোদিনীর সেই অনুক্ত প্রতিবাদকে নিজের কণ্ঠে তুলে নিয়ে পুরুষ সমাজকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল।

আমি বিনোদিনীকে নিয়ে লেখা বেশক'টি নাটক কলকাতায় দেখেছি। এই সব নাটকে যারা কুশীলব ছিলেন, তারা সবাই কীর্তিমান অভিনয় শিল্পী। কিন্তু শিমূলের অভিনয় দীপ্তির কাছে তাদের অভিনয় আমার কাছে ম্লান মনে হয়েছে।

শিমূলকে আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন। যে কোনো চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সেই চরিত্রের অন্তর্গামী সত্তায় প্রবেশ করতে হয়। শিমূল তা করতে পেরেছে। সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দন জানাই নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুকেও। ওই দিন বাচ্চুর মঞ্চ সজ্জা, আলোক-সম্পাত এবং নাট্য নির্দেশনায় বিনোদিনী হয়ে উঠেছিল আরো প্রাণবন্ত। সাধুভাষায় লিখিত স্মৃতিকথাকে একক অভিনয় উপযোগী করে লেখা এবং মাঝে মাঝে বিনোদিনী অভিনীত বিভিন্ন নাটকের প্রয়োজনীয় সংলাপ মূল নাটকে সংযোজন করা খুবই কঠিন কাজ। বাচ্চু এই কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করে বিনোদিনীর নাট্যরূপ দিয়েছে। তার এই পারদর্শিতা সকল দর্শক কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে।

শিল্পীযোদ্ধা নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু শিমূলের স্বামী, সহকর্মী, সহ-অভিনেতা এবং তার শিল্পযুদ্ধে শরিক হওয়ার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। একজন আর একজনের যথার্থ পরিপূরক। তাদের কর্মময় জীবন দীর্ঘতর হোক, শিল্পের প্রতি নিষ্ঠায়, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতায় এবং পরস্পরের প্রতি ভালোবাসায়।

শিমূল ইউসুফের জন্ম একুশে মার্চ ১৯৫৭। বাবা-মায়ের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে শিশু শিল্পী হিসেবে মঞ্চে অভিনয় এবং সঙ্গীত জীবনের সূচনা করে (১৯৬২)। পরের বছর ১৯৬৩ সালে রেডিও পাকিস্তানে শিশু শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পাকিস্তান টেলিভিশনে সঙ্গীত পরিবেশন করে। ১৯৭৪ সালে ঢাকা থিয়েটারে যোগ দেয়ার পর প্রায় একত্রিশটি নাটকে কাজ করেছে শিমূল। ১৯৭৯ সালে মুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বাচ্চুকে জীবনসঙ্গী এবং সহযোদ্ধা হিসেবে পাওয়ায় শিমূলের জীবনের লক্ষ্যের পথে চলা অনেকটা সুগম হয়েছে।

দৈনিক সংবাদ, ৫ এপ্রিল ২০০৭

সোহরাব হাসানের কাছে লেখা চিঠি

প্রিয় সোহরাব,

তুমি লেখা চেয়েছ। আমি কী লিখব, কী বিষয় নিয়ে লিখব ভেবে পাচ্ছি না। চারিদিকে বিষয়ের এত ছড়াছড়ি, তুমি ভাবছ সেখান থেকে একটা বিষয় তুলে নিলেই তো হয়। অবশ্যই যে কোনো একটা বিষয় তুলে নিতে পারি।

গত ১৭ এবং ১৮ জুলাই পর পর দু'জন নারীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। একজন সুপ্রিম কোর্টের খ্যাতনামা আইনজীবী। অন্যজন ভিকারুননিসা কলেজের ছাত্রী। বিডিআর কর্মকর্তার সুপ্রিয় কন্যা। এদের নিয়েও তো লেখা যায়। কিন্তু সব রাস্তা যে রোমের দিকে চলে যায়। অতটুকু হাঁটা একাশি বছর বয়সে আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এই যে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর চলে গেলেন, কাকে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন, কেই বা এখন রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে আছেন। এ সম্পর্কে দেশবাসী কিছুই জানে না। এটাও তো লেখার একটা বিষয় হতে পারে।

যোগাযোগ উপদেষ্টা জেনারেল মতিন বলেছেন, সংস্কার করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর সরকারের কোনো চাপ নেই। তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সংস্কার করছে। অন্যদিকে আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন, আশানুরূপ সংস্কার না হলে ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হবে না। এটাকে বিষয় করেও তো একটা কিছু লেখা যায়।

বিএনপি এবং আওয়ামী লীগে সংস্কার প্রশ্ন নিয়ে যে দ্বিমতের সূচনা হয়েছে, তা নিয়েও তো লেখা যায়। সংস্কারপন্থী তোফায়েল ও রাজ্জাক শেষ পর্যন্ত কেন হাসিনাপন্থী আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, প্রবীণ নেতা জিলব্লুর রহমানের কাছে গেলেন। তাও তো লেখার একটা বিষয় হতে পারে।

ক'দিন আগে শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করতে গিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যে যুদ্ধংদেহী তৎপরতা দেখাল। তা নিয়ে বিদেশী সংবাদ মাধ্যম তো বটেই, দেশের সুশীল সমাজও সমালোচনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগেই তাকে গ্রেফতার করা ঠিক হয়নি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সে যে দুর্নীতি করেছে, প্রমাণ সাপেক্ষে তাকে তো জামিন দেয়া যেত। দেশের মানুষ যে সরকারকে নির্দ্বিধায় সমর্থন দিয়ে আসছে তারা সেই সরকারের কাছে ন্যায়বিচার অবশ্যই আশা করে। হাসিনার প্রতি একতরফা বিরূপতা সরকারের উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

যে বিষয়টা আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছে, তাহলো দেশের বিভিন্ন নীতিগত প্রশ্নে উদেষ্টাদের পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য এবং উক্তি। সমন্বিত কার্যকলাপের অভাব। যে সরকারকে কিছু বৈপব্লবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়ার জন্য সমর্থন জানিয়ে লিখে আসছি, সেই সরকারের দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু এলোমেলো নীতি আমাকে খুবই কাতর করেছে। মনে হয়েছে, এ সরকার যদি তাদের হাতে নেয়া সমস্যাগুলোর সমাধান করতে ব্যর্থ হয় এবং তাদের ভ্রান্তপথ অনুসরণের জন্য দিন দিন জনগণের আস্থা হারায়, তাহলে আমাদের ভরসার জায়গা কোথায়?

বর্তমান সরকার আইনের শাসন কায়েমের জন্য বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের কাজ যে করে চলেছেন তাকে জনগণ সাধুবাদ জানিয়েছে। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশন পুনর্গঠন এবং তাদের কার্যকলাপ জনগণ কর্তৃক নন্দিত হয়েছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠনের কাজটিও তারা সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু যে কমিশনটি সবচেয়ে সচল হওয়ার কথা, যে কমিশনের কর্মতৎপরতার ওপর নির্ভর করছে আগামী দিনের অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন। সেই নির্বাচন কমিশন তাদের কাজে আশানুরূপ গতি সঞ্চার করতে পারেনি। এ নিয়ে মানুষের মনে ক্ষোভ আছে। সংশয় আছে নির্বাচন কমিশন যদি ধীরগতিতে চলে তাহলে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে কি না।

সম্প্রতি বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও জাতীয় অধ্যাপক তালুকদার মুনীরুজ্জামান সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক মন্তব্যে বলেছেন, বর্তমান দৃশ্যপটে আমরা চারটি শক্তি দেখতে পাচ্ছি। এগুলো হচ্ছে– তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সেনাবাহিনী, বিএনপি ও আওয়ামী লীগ। এরমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষণস্থায়ী। বিএনপি ও আওয়ামী লীগ এই দুটি রাজনৈতিক শক্তিকে যদি সংস্কারের নামে দুর্বল করে ফেলা হয় তাহলে দেশের একক ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হবে সেনাবাহিনী। এর ফলে সেনাবাহিনী জনগণের প্রতিপক্ষ শক্তি হিসেবে দাঁড় হবে। আর এটা হবে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়কর। সেনাবাহিনী যদি জনগণের প্রতিপক্ষ শক্তি হিসেবে একবার বিতর্কিত হয়ে যায়, তাহলে জাতি হিসেবে আমরা যে ক্ষতির মধ্যে পড়ব, তা থেকে উত্তরণ মোটেই সহজ হবে না। অনেকে নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের নামে সেনাবাহিনীকে ক্ষমতার অংশীদার করার কথা বলছেন। এটা ভ্রান্ত ধারণা। প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনাবাহিনী যাতে কোনো প্রকার ক্ষতির মুখে না পড়ে সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

জাতীয় অধ্যাপক তালুকদার মুনীরুজ্জামান পরিস্থিতির যে বিশেব্লষণ দিয়েছেন, তাতে সবাই একমত নাও হতে পারেন, কিন্তু এতে শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট উপকরণ আছে। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ কী? আমি বার বারই বলব– দ্রুত নির্বাচন, দ্রুত নির্বাচন, দ্রুত নির্বাচন।

বর্তমান সরকার স্বাধীন, নিরপেক্ষ, নির্দলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। তারা ক্ষমতায় না এলে দেশে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হতো এবং আমরা যে গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত হতাম সে সম্পর্কে কারো কোনো সংশয় নেই।

শেখ হাসিনা, যিনি এখন কারাবন্দি। তিনিও সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে সুদৃঢ় সমর্থন দিয়েছিলেন। এও বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে সংসদে এই সরকারের বৈধতা স্বীকার করে বিল পাস করবেন। তারপর কেন হঠাৎ করে তিনি নিরপেক্ষ সরকারের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ালেন, কেন আওয়ামী লীগকে দ্বিখণ্ডিত করে তাকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা নেয়া হলো, এর নেপথ্য

শক্তি কে বা কারা, তা বিশেৱষণ করা খুবই কঠিন। শেখ হাসিনার মতো একই অভিযোগে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি এবং জোট সরকারের প্রতিমন্ত্রী মুজাহিদী। তাকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাকে গ্রেফতারও করা হয়নি। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ সরকার শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে কেন আওয়ামী লীগকে প্রতিপক্ষ বানালেন, সে রহস্য এখনো অনুদঘাটিত রয়ে গেল। যেখানে সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন উ আহমেদ বার বার বলেছেন, আমরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য মোটেই আগ্রহী নই। আমরা শুধু সরকারকে সাহায্য ও সহযোগিতা দিচ্ছি। তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা হিসেবে ঘোষণা দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী সমর্থিত সরকার নিরপেক্ষ না থেকে কেন বৈষম্যমূলক আচরণ করছেন সেটাও সকলের বোধের অগম্য।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি গল্প মনে পড়ছে। তখন আমার বন্ধু সাহিত্যিক, সাংবাদিক শহীদ সাবের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। কেউ সিগারেট খেয়ে ফেলে দিলে সেই অর্ধদগ্ধ সিগারেট কুড়িয়ে নিয়ে ধূমপান করত। এই মানসিক অবস্থায় সে ঢাকায় কখনো সুফিয়া কামাল, কখনো সন্‌জীদা খাতুনের আশ্রয়ে থাকত। সে চট্টগ্রামে গিয়ে ওই সময় আমার বাসায় ছিল। তার সঙ্গে আমি একটি চুক্তি করি। চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল, সে আর কোনোদিন লোকের ফেলে দেয়া সিগারেট তুলে ধূমপান করবে না। আমি তাকে কবিতা লেখার জন্য প্রতিটি কবিতার মূল্য দেবো চারআনা করে। আর যদি প্রবন্ধ লেখে তার জন্য দেবো পাঁচ টাকা। দেখি, সে প্রবন্ধের বদলে শুধুই কবিতা লেখে। জিজ্ঞেস করাতে বলল, চার লাইনেও কবিতা লেখা যায়। এরকম দশটি কবিতা লিখতে আমার এক ঘণ্টাও লাগে না। তাতে আমার লাভ হয় বেশি। আড়াই টাকা দিয়ে আমি বেশ কয়েক প্যাকেট স্টার সিগারেট কিনতে পারি। আর প্রবন্ধ লিখতে কষ্ট করতে হয়, সময় লাগে, মাথা ঘামাতে হয়। তাই আমি কবিতা লেখাটাকেই বেছে নিয়েছি। তাকে বললাম, শুধু শুধু আমরা তোমাকে পাগল বলি। তোমার বুদ্ধির প্রখরতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। সে জবাব দিয়েছিল আমি মোটেই পাগল নই। তোমরাই আমাকে পাগল বানিয়েছ। কমিউনিস্ট পার্টি আমার সদস্যপদ বাতিল করেছে। একজন নারী আমাকে এক বছর ভালোবেসে পরে প্রত্যাখ্যান করেছে। সরকারের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও একদা কমিউনিস্ট পার্টি করতাম বলে চাকরি পাইনি। তারপরও তুমি আমাকে সুস্থ থাকতে বলো।

চট্টগ্রামে দৈনিক আজাদী পত্রিকায় দুশ' টাকা বেতনে তাকে চাকরি ঠিক করে দিয়েছিলাম। সে দশ-পনের দিন যাওয়া-আসা করার পর বলল, আমি ওখানে কি লিখবো। যা লেখার তা মওলানা আকরম খাঁ বহু আগেই লিখে গেছেন। সম্প্রতি লিখতে শুরু করেছেন ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান, আমাদেরই কিছু বুদ্ধিজীবী বন্ধু-বান্ধবের উৎসাহ এবং প্রেরণায়। উলেৱখ্য, তখন আইয়ুব খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। চারিদিকে চোর ধর, চোর ধর ধ্বনি দিয়ে রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার করছে। এর প্রতিবাদ জানিয়ে শহীদ সাবের আজাদী পত্রিকায় উপ-সম্পাদকীয় লিখেছিল। সুবিদিত কারণে তা ছাপা হয়নি। আমার অবস্থাও অনেকটা শহীদুলৱাহ সাবেরের মতো।

সমাজ যখন দুর্বলকে অত্যাচার করে সবলের আত্মপ্রতিষ্ঠার সহজ পথ বেছে নেয়। তখন আমি কবিতায় তার প্রতিবাদ করি। এই প্রতিবাদী কবিতার জন্য আমার যত যশ-খ্যাতি। জীবনে এজন্য আমার অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। কখনো হাত ভেঙেছে, পা ভেঙেছে, মাথা রক্তাক্ত হয়েছে। কখনো মাথার উপর হুলিয়া নিয়ে ফেরারি হয়ে থাকতে হয়েছে। পাকিস্তান সরকার উনিশ বছর আমাকে পাসপোর্ট দেয়নি। রেডিও-টেলিভিশনে ছিলাম কালো তালিকাভুক্ত। কিন্তু কোনোদিন হাল ছাড়িনি। বর্তমান সরকারকে আমি তাঁবেদার সরকার মনে করি না। তাই প্রথম থেকেই তাদের সর্বাত্মক সমর্থন দিয়েছি। যারা সরকার চালাচ্ছেন, তারা আমাদেরই লোক। যিনি সরকার-প্রধান, তিনি শুধু একজন ক্ষমতাধর ব্যক্তি নন, একজন দেশপ্রেমিক এবং রবীন্দ্রপ্রেমী হিসেবে তার সুনাম আছে। সত্য উচ্চারণের জন্য তাদের যদি ভয় করতে হয়, দাঁড়াবো কোথায়?

আমি এখন লণ্ঠন হাতে স্বদেশকে নিরন্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি– এর সামগ্রিক রাজনীতির মধ্যে, এর সংস্কৃতির মধ্যে, এর সামাজিক বিপন্নতার মধ্যে। মাঝে মাঝে স্বদেশের কাছে এসেও বার বার দূরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছি। এই বেদনা একজন কবির বেদনা। এই বেদনা থেকেই কবিতার জন্ম।

–মাহবুব উল আলম চৌধুরী
উত্তরা, ঢাকা
১৯ জুলাই ২০০৭

সোহরাব হাসান
সহযোগী সম্পাদক
দৈনিক যুগান্তর

স্মৃতির আলোয় ঈদ

মুসলমান ধর্মে উৎসব আয়োজনের সংখ্যা খুবই কম। প্রধান দু'টি উৎসব ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এই দু'টি উৎসব আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়।

ঈদুল আযহার তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছুটা প্রতীকী। ওই দিন মুসলমানরা পশু কোরবানি দিয়ে তার গোশত আত্মীয়-স্বজন বিশেষত দুস্থ দরিদ্রজনের মধ্যে বিতরণ করে। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) আলৰাহর নির্দেশে তার জ্যেষ্ঠপুত্র হজরত ইসমাইলকে কোরবানি করতে উদ্যত হন আরবের মিনা নামক স্থানে, প্রায় ৩ হাজার ৮শ বছর আগে। তার ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়ে আলৰাহ হজরত ইব্রাহিমকে তার পুত্রের স্থলে একটি পশু কোরবানি করতে নির্দেশ দেন। সেই থেকে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীরা পৃথিবীর সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে কোরবানির ঈদ পালন করে থাকে।

প্রাচীনকালের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, মহাকবি হোমার তার মহাকাব্য ইলিয়াডে বর্ণিত আউলিসে অবরুদ্ধ আগামেমনন, দেবী ডায়ানাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিজ কন্যা ইফিজেনিয়াকে বলিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়ে ডায়ানা ইফিজেনিয়ার পরিবর্তে একটি মেষ কোরবানি দেয়ার নির্দেশ দান করেন। ঘটনাটি আমার মনে হয় প্রতীকী। প্রত্যেক ধর্মে এ ধরনের বলিদানের প্রথা আছে। এখনো কোনো কোনো স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নরবলি দেয়ার প্রথা চালু আছে।

চার বছর বয়সে আমি আমার মাকে হারাই। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতের বছর। কাজেই মাকে নিয়ে ঈদুল আজহার কোনো স্মৃতি নেই। আমার জেঠাইমা, নানী এবং মামাদের নিয়ে কিছু স্মৃতি আছে। চট্টগ্রামে কে কত বেশি দামের গরু কোরবানি দিতে পারে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। গ্রামে দেখেছি, আমার মামারা এই প্রতিযোগিতায় শরিক হতেন। হাটের সবচেয়ে বড় গরুটি কিনতেন। গরুটি দেখার জন্য নানাস্থান থেকে লোক আসত। কিন্তু ছোটবেলা থেকে পশু কোরবানি দেখতে আমার তেমন উৎসাহ ছিল না। পাড়ার মধ্যে কে আগে কোরবানির গোশত রান্না করতে পারে তা নিয়েও এক ধরনের প্রতিযোগিতা হতো। এই প্রতিযোগিতায়ও আমার নানার বাড়ি প্রথম স্থান হতো। ওই সময় আমরা সবাই নতুন পোশাক পরে পাড়া-প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গিয়ে কুশল বিমিনয় করে গোশত দিয়ে রুটি খেতাম।

আমি আগেও বলেছি, এ অনুষ্ঠানটি প্রতীকী। হজরত রসূলে করীম (সাঃ) মদীনা গমন করলে দেখেন ওখানে পারস্য সভ্যতার প্রভাবে পূর্ণিমার নওরোজ নামে এবং বসন্তের পূর্ণিমার মেহেরজান নামের দুটি উৎসব মদীনাবাসী বিভিন্ন ধরনের আনন্দ আহলাদ, খেলাধুলা এবং রঙ তামাশার মাধ্যমে উদযাপন করত। উৎসব দু'টির রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারকে রসূলুলৰাহ মনে করতেন ইসলামের আদর্শের পরিপন্থী। তিনি মদীনাবাসীদের ডেকে বললেন, জাহেলি যুগের এই উৎসবগুলো তোমরা বর্জন করো। আলৰাহ তোমাদের জন্য ওই উৎসবদ্বয়ের পরিবর্তে মানবতাবাদী দু'টি দিবস দান করেছেন। একটি হলো ঈদুল আজহা ও অন্যটি ঈদুল ফিতর।

মক্কায় জাহেলিয়াত যুগে যে কোরবানি দেয়া হতো তাতে মূর্তি এবং প্রতিমার গায়ে কোরবানির বলির রক্ত মাখানো হতো। গোশত প্রতিমার প্রসাদরূপে বিতরণ করা হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নরবলি দেয়ারও প্রথা ছিল। রসূলুলৰাহ ইসলাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ওই সমস্ত কুসংস্কারমূলক উৎসব বন্ধ করে দেন।

আমি ছোটবেলায় নানীর কাছে প্রশ্ন করতাম, কোরবানির গোশত এবং রক্ত আলৰাহর কাছে পাঠানো যায়? তিনি কি তা ভক্ষণ করেন? নানি তওবা তওবা কয়েকবার পাঠ করে বলেছিলেন, কোরআনে বর্ণিত আছে, কোরবানির রক্ত আলৰাহর কাছে পৌঁছায় না। এর গোশতও পৌঁছায় না। তার কাছে পৌঁছায় কোরবানির সদিচ্ছা বা নিয়ত।

আমি এখনো ভাবি– কোরবানিতে যত অর্থ ব্যয় হয় তা দরিদ্রের কোনো কাজে আসে না। এই অর্থ যদি দরিদ্রদের পুনর্বাসনে এবং তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির জন্য ব্যয় হয় তাতে আলৰাহ যেমন খুশি হবেন, তেমনি এ দেশের দরিদ্র মানুষেরও উপকার সাধিত হবে।

তবে ঈদুল আজহা এবং ঈদুল ফিতরের সবচেয়ে যে ব্যাপারটি আমার ভালো লাগে তাহলো– ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে। সবাই আত্মীয়-স্বজন এবং বুজুর্গ ব্যক্তিদের কবর জেয়ারত করে।

ঈদকার্ড বিনিময়ও এখন জনপ্রিয় প্রথায় পরিণত হয়েছে। এই ঈদ উৎসবে গ্রাম বাংলায় ঈদের মেলা বসে। মেলায় আসে লোকশিল্পজাত নানা পণ্যদ্রব্য। নকশী কাঁথা, পুতুল, রঙিন বেলুন, বাঁশি, ঢোল, একতারা প্রভৃতি পণ্যে ভরে যায় মেলা। নানা রঙের পতাকা নিয়ে রাস্তায় শোভাযাত্রাও বের হয়। এছাড়া ঈদ মেলায় মারফতী, মুরশিদী এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক সঙ্গীতেরও আসর বসে। দিনে দিনে এই উৎসব সামাজিক উৎসবে পরিণত হচ্ছে। যেখানে সকল ধর্মের লোক একত্রিত হওয়ার সুযোগ পায়। এতেই আমি বেশি আনন্দ বোধ করি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ঈদ উল আযহা সংখ্যা ২০০৭
[কবির সর্বশেষ লেখা]

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবির প্রদত্ত ভাষণ এবং শুভেচ্ছা বাণী

জাতীয়ভাবে উদযাপিত
কবির ৮০তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ

সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত গুণীজন, আমার জন্মজয়ন্তী উদযাপন কমিটির উদ্যোক্তাবৃন্দ ও সুধী সমাবেশ–

আমার ৭৮তম জন্মদিনে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক স্নেহভাজন গোলাম কুদ্দুছ ঘোষণা দিয়েছিলেন, তারা আমার ৮০তম জন্মজয়ন্তী জাতীয়ভাবে পালন করবেন। তারই ধারাবাহিকতায় জাতীয় কমিটির উদ্যোগে আজকে আমার জন্মদিন পালন করা হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এতে আমি আনন্দিত এবং আবেগে যেমন আপ্লুত হয়েছি তেমনি বিষণ্ণও হয়েছি, দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতির জন্য। সারাজীবন একটি স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ স্বদেশের স্বপ্ন দেখেছি। তার জন্য সাধ্য অনুযায়ী লড়াই করেছি। একাত্তরে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি। তার জন্য গর্ব অনুভব করি। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করি আজ যে স্বদেশে আমরা বাস করছি, এরকম একটি বাংলাদেশ কি আমরা চেয়েছিলাম? সব পেয়েছির দেশ না হলেও একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং বাঙালি জাতি পরিচয়ে গর্বিত একটি গণতান্ত্রিক দেশ আমরা চেয়েছিলাম। সে দেশ এখন মৌলবাদী, ধর্মান্ধ, ধর্ম ব্যবসায়ী এবং স্বাধীনতার মূলনীতির বিরোধী শক্তির দখলে। দীর্ঘদিন এদের শাসনে আমরা যা সত্য বলে অর্জন করেছিলাম তা ধীরে ধীরে মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে।

আমরা যারা দিনের পর দিন বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে রক্তাক্ত হয়েছি। কলকাতার ধরমতলায় রশীদ আলী দিবসে জীবন দিয়ে একুশে স্বদেশে ফিরেছি। একাত্তরে আবার রক্ত দিয়ে সেই স্বদেশকে মুক্ত করেছি। এখন দেখছি আমাদের স্বাধীনতার মূল্যবোধগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার এবং দুর্বৃত্তদের পদচারণা রাজনীতিকে কলুষিত করে ফেলেছে। একটি শ্রেণী দেশকে এখন খুদে পাকিস্তান বানাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। একটি সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আমাদের রাজপথে রক্ত দিতে হচ্ছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আমি উদ্যোক্তাদের জানিয়েছিলাম এই উদ্যোগ স্থগিত রাখতে। তারা দুঃসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার জন্মদিনকে উপলক্ষ করে নিজেদের নতুন সংগ্রামে উজ্জীবিত করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করায় আমি এতে রাজি হয়েছি। প্রার্থনা করি, তাদের প্রত্যাশা সফল হোক। তারা নতুন সংগ্রামের জন্য সাহস সঞ্চয় করুক।

মানুষ জীবনের কোনো না কোনো সময় তার জীবদ্দশায় নিজের কীর্তি-কর্ম, অবদান, দোষ-ত্রুটি, ভালো-মন্দ, আচার-আচরণ সম্পর্কে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সহকর্মীরা কী ধারণা পোষণ করেন, তা জানতে আগ্রহী থাকেন, বিশেষ করে শেষ বয়সের দিকে। আমার জীবন এবং কর্ম নিয়ে ১৪৫ জন লেখক-লেখিকার ৪৫০ পৃষ্ঠার স্মারকগ্রন্থে যেসব লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্য থেকে আমি অবশ্যই জানতে পারব আমার সম্পর্কে আমার শুভানুধ্যায়ীরা কে কী ভাবেন। এই আনন্দ দিনে এটি আমার একটি উপরি পাওনা। এজন্য স্মারকগ্রন্থের লেখক-লেখিকাদের আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সম্পাদনা পরিষদকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

চট্টগ্রামে আমার শেকড়, আমার যৌবনকালের কর্মস্থল। এই চট্টগ্রামে আমি আমার যৌবনকালে বহু দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছি। আজকের অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম থেকে ৪০ জনের একটি সাংস্কৃতিক দল এসেছে আমার এই সংবর্ধনায় শরিক হতে। আমি তাদের উদ্দেশে গভীর শুভেচ্ছা, ভালোবাসা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

আমার ৮০ বছর বয়সে এই সংবর্ধনার মধ্যদিয়ে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন, ঋণী করেছেন। ঋণের একটি দায়বদ্ধতা আছে। ফুলের দায়বদ্ধতা পাথরের চেয়ে বেশি ভারী। আমি এই সংবর্ধনা সভায় আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতে চাই, যেমন রবার্ট ফ্রস্ট দিয়েছিলেন তাঁর কবিতায়।

The woods are lovely dark and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সব ধরনের ঝঞ্ঝা-ঝড় উপেক্ষা করে আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব, আপনাদের মিছিলে থাকব। যেমন আগে ছিলাম। অত্যাচারী যদি আমাকে আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করে মাটিতে ফেলে দেয় তখনো আমি আপনাদের পাশে থাকব। যতক্ষণ না মানুষের জন্য শেষ বিজয় আমরা ছিনিয়ে আনতে পারি। আপনাদের কথা দিলাম।

বাংলা সাহিত্যের এক মনীষী লিখেছিলেন, জীবন একটা বুঝিবার জিনিস। কিন্তু বুঝিল সে কে ? বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন। আমরা রবীন্দ্রনাথের মানস সন্তান। তিনি বলেছিলেন, জীবন মানে নিরন্তর এগিয়ে যাওয়া। বলেছিলেন, আনন্দই জীবনের উৎস। তিনি তাঁর চরম দুঃখের দিনে আবার বলেছিলেন, আমি ক্রমে বুঝতে পারলুম জীবনকে মৃত্যুর জানালার ভেতর দিয়ে না দেখলে তার সত্যরূপ দেখা যায় না। মৃত্যুর আকাশে জীবনের যে বিরাট মুক্তরূপ প্রকাশ পায়, প্রথমে তা বড় দুঃসহ। কিন্তু তারপরে তার ঔদার্য মনকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন জীবনের ব্যক্তিগত সব সুখ-দুঃখ সৃষ্টির ক্ষেত্রে হাল্‌কা হয়ে দেখা দেয়। তিনি আরো বলেছেন, কর্মই জীবন। কর্মই জীবনের মহত্ত্বকে গৌরব দান করে।

মহামতি লেনিন আমার একজন অতিপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, একজন কালজয়ী প্রতিভা। তাঁর সমসাময়িককালে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সর্ববিষয়ে অগ্রসর চিন্তার অধিকারী। তিনি জীবন সম্পর্কে বলেছেন, মানুষের সম্পদ হলো তার জীবন। এই বাঁচার সুযোগ বার বার আসে না। সুতরাং এমনভাবে বাঁচতে হবে যেন কাপুরুষতার ধিক্কার নিয়ে তিলে তিলে অনুশোচনায় মরতে না হয়। এমনভাবে বাঁচতে হবে যেন বছরের পর বছর উদ্দেশ্যবিহীন বিভ্রান্তিতে দগ্ধ হয়ে না মরতে হয়। বাঁচতে হবে এমনভাবে যাতে সে বলতে পারে, আমার জীবনের সর্বশক্তি নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছি পৃথিবীর মহত্তর আদর্শের পেছনে। সে আদর্শ আর কিছুই নয়, মানব জাতির মুক্তি।

আমি একান্ত ছোটবেলা থেকে এই মানব জাতির মুক্তির ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছি। এর পেছনের কারণগুলো আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি। পরে সিদ্ধান্তে এসেছি, এই মানব জাতির মুক্তি আর কিছু নয়, জীবনের সমস্ত ক্লেদাক্ত আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে, সকল বাধা অতিক্রম করে মানুষ যেন সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের সাধনায় ব্রতী হতে পারে। তার জন্য পরিচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুক্ত হতে পারে। লেনিনের মানব মুক্তির অর্থ দাঁড়ায় সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র শাসন থেকে মুক্তি, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, ক্ষুধা থেকে মুক্তি, পুরুষ শাষিত সমাজে সামাজিক নির্যাতন থেকে নারীর মুক্তি, ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তি, বুদ্ধির মুক্তি, শ্রেণী শোষণ থেকে মুক্তি, অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি, সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি। এসব অন্যায় অবিচার থেকে মুক্ত হয়ে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা– যেখানে সকল মানুষ সুখে-শান্তিতে সাম্যের আদর্শে বাঁচার অধিকার ভোগ করবে।

মার্কসীজম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে একান্ত অল্প বয়সেই আমি এই মুক্তির সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করেছি। ভারত-ছাড়ো আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, বন্দিমুক্তি আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সামন্তবাদী এবং পুঁজিবাদী সমাজে কৃষক ও শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন, সর্বব্যাপী সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তানকে উচ্ছেদের আন্দোলন প্রভৃতি মানবমুক্তির আন্দোলনে আমি শরিক হয়েছি। এ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে আমার চেতনাকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেছি। আমার সাংগঠনিক শক্তিকে দৃঢ়তর করেছি। আমার সৃজনশীল সাহিত্যকর্মকে জনঘনিষ্ঠ করেছি। বিশ্বব্যাপী আণবিক বোমা নিষিদ্ধকরণের দাবিতে এ দেশের জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছি। কোনোদিন কোনোভাবে রাজবন্দনা করিনি।

আমার এই চেতনার পেছনে মার্কস্‌বাদের শিক্ষা যেমন আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে তেমনি ছোটবেলায় আমার শিক্ষক মাতামহের সাহচর্য আমাকে সাহস যুগিয়েছে। তিনি ছোটবেলায় আমার যে হাতেখড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন, তা যেমন ছিল অভিনব তেমনি মানবতাবাদী। হাতেখড়ির সময় আমার মুখোমুখি বসে ছিলেন তিনজন বিদগ্ধ ব্যক্তি। একজন জ্ঞানী মাওলানা, মাঝখানে আমার নানা এবং তাঁর পাশে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। মাওলানা আমাকে উচ্চারণ করতে বলেছিলেন, 'রাব্বি জিদ্‌নি ইল্‌মান– অর্থাৎ প্রভু আমাকে জ্ঞান দান করো'। নানার মুখে মুখে বলেছিলাম– 'হে প্রভু আমাকে সৎ মানুষ করো'। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমাকে জ্ঞান দান করেছিলেন 'তমোসমা জ্যোর্তিগময়– হে প্রভু আমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও'।

আমার জীবনে হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের এই ঘটনা আমাকে মুক্তবুদ্ধি চর্চার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। অসাম্প্রদায়িক মানুষ হতে সাহায্য করেছে। যার ফলে পাকিস্তানের তমসায় কোনোদিন আচ্ছন্ন হইনি। জীবনে ঐতিহ্যের মূলধারা থেকে কখনো বিচ্যুত হইনি। মধ্যপ্রাচ্যের বীরদের দিকে না তাকিয়ে আমি দেশের জাতীয় বীরদের প্রতি সারাজীবন শ্রদ্ধা পোষণ করেছি। সিরাজ-উদ-দৌলা, টিপু সুলতান, ঝাঁসির রাণী, তিতুমীর, ভগবৎ সিং, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন, মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা– যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তারাই ছিলেন আমার দেশপ্রেমের উৎস। আমি তাঁদের গৌরবে গৌরব অনুভব করেছি।

আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকদের আমি কোনোদিন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে বিভাজন করিনি। আলাওল, দৌলত কাজী, চণ্ডিদাস, কবি জয়দেব থেকে শুরু করে মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিম চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, কাজী আবদুল ওদুদ, হুমায়ুন কবির, হীরেন মুখার্জি, গোপাল হালদার, সুকান্ত ভট্টাচার্য সবাইকে আমাদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত হিসেবে সারাজীবন বিবেচনা করেছি। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছি।

এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সারাজীবন আমি অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। সেই ধারাবাহিকতা এখনো বজায় রেখেছি। এই চেতনার আলোকে অন্ধকার অপসারণের চেষ্টা করে যাচ্ছি। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করবেন যেন মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার লেখায় এবং কর্মে এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারি। রবার্ট ফ্রস্টের মতো যেন বলতে পারি–

শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে আমাকে আরো দূরে যেতে হবে, অনেক দূরে।
মিছিলে পা মেলাতে হবে।

আমার অনেক প্রতিশ্রুতি আছে, যা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।
সেই প্রতিশ্রুতি আমার রাখতেই হবে।
আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী
জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা
৮ নভেম্বর ২০০৬

স্বরচিত কবিতার সিডির
মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে কবির ভাষণ

স্নেহভাজন সভাপতি, সম্মানিত প্রধান অতিথি, প্রিয়ভাজন আবৃত্তি শিল্পীবৃন্দ এবং শ্রোতৃমণ্ডলী।

আমার কবিতার সিডি প্রকাশ করার জন্য আমি ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠীর কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ আবৃত্তি শিল্পীদের কাছে, যারা আমার কবিতাকে ভালোবেসে কণ্ঠে ধারণ করেছেন।

আমি নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং বহু প্রবন্ধ লিখেছি। কিন্তু মূলত আমি কবি। আমি রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যকে একই মেল-বন্ধনে মিলিয়েছি। তাই আমার কবিতা রাজনীতির হাত ধরে হাঁটে। কিন্তু আমি সবসময় সতর্ক থাকি যেন আমার কবিতাকে রাজনীতি গ্রাস করতে না পারে। আমি কবিতাকে সমাজ পরিবর্তনের মহত্তম উপায় হিসেবে সারা জীবন ব্যবহার করেছি। আমি নিরন্নের অন্ন পাওয়ার সংগ্রামকে যেমন আমার কবিতায় এনেছি তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজ যখন দুর্বলকে অত্যাচার করে, সবলের আত্মপ্রতিষ্ঠার সহজ পথ বেছে নেয়, তখন স্থির থাকতে পারি না। যারা ক্ষমতাবান, বিশ্বজুড়ে ক্ষমতার দাপটে মানুষকে হেয় জ্ঞান করে হিটলার ও বুশের মতো উগ্র আস্ফালনে মানুষের জীবনের শান্তি ও স্বস্তি কেড়ে নেয়, যুদ্ধ চালিয়ে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর উপর অমানবিক আঘাত করে, তার বিরুদ্ধেও আমার কবিতা কথা বলে। এ ক্ষেত্রে আমি একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী।

সারাজীবন রাজনীতি ও কবিতার জন্য আমাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। কখনো হাত ভেঙেছে, পা ভেঙেছে, মাথা রক্তাক্ত হয়েছে। কখনো মাথার ওপর হুলিয়া নিয়ে ফেরারি হয়ে থাকতে হয়েছে। পাকিস্তান সরকার উনিশ বছর আমাকে পাসপোর্ট দেয়নি। রেডিও-টেলিভিশনে ছিলাম কালো তালিকাভুক্ত। কিন্তু কোনোদিন হাল ছাড়িনি। আমার চেতনা হতাশায় এবং অন্তহীন যন্ত্রণায় যখন ডুবতে বসে, আমি চোখের জলে তার সমাধান খুঁজি না। আমি নিজের মতো করে তার মোকাবেলা করি। আমার কবিতা বহুবার সরকারের রক্তচক্ষুর সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু সত্য অনুসন্ধানে আমি কোনোদিন ক্লান্তি অনুভব করিনি। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অশুভ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করিনি। রাজবন্দনা করিনি। এই চেতনাকে ধরে রাখার সংগ্রামই আমার কবিতার সংগ্রাম।

আমি সহজ সরল ও সাবলীল ভাষায় এবং আঙ্গিকে কবিতা লিখতে ভালোবাসি। আধুনিক কবি হওয়ার জন্য দুর্বোধ্যতাকে প্রশ্রয় দেই না। প্রগতির পথ সামনে হাঁটার, সৌন্দর্যবোধের পথ ঊর্ধ্বে ওঠার। আমি আমার কবিতায় প্রগতি এবং সৌন্দর্যবোধের সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করি। এক বছর আমি রবীন্দ্রনাথ পড়েছি। এরপর যখনি কবিতা লিখতে বসেছি মনে হয়েছে এটা আমার কণ্ঠ নয়, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ। কী করে এই সংকট থেকে মুক্ত হওয়া যায় তার জন্য পাবলো নেরুদা, লোরকা, লুই আরাগঁ, স্টিফেন স্প্যান্ডার, ডে লুইস, টি এস ইলিয়ট, এজ্‌রা পাউন্ড, বোদল্যাঁয়ার প্রমুখ কবির কবিতাকে নিত্যসঙ্গী করেছি। এর ফলে ৫২ সালে এসে আমি নিজস্ব কণ্ঠস্বর আবিষ্কার করি। তারই ফসল 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'। সেই থেকে আমি নিজস্ব স্টাইলে, নিজস্ব আঙ্গিকে কবিতার শরীর নির্মাণ করি।

ঐতিহ্য সন্ধানে আমি চণ্ডীদাসের– 'শোন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' এবং চট্টগ্রামের কবি মোহাম্মদ সগীরের– 'নানা বরণ গাভীরে ভাই / একই বরণ দুধ / জগত ভ্রমিয়া দেখি / একই মায়ের পুত' এই পঙ্‌ক্তিমালার শরণাপন্ন হই। রাজবন্দনা করতে অস্বীকার করায় চর্যা গীতিকার কাহ্নপার দুই হাত কেটে দেয়া হয়েছিল। কবিভক্ত ডোম্বিকে ফাঁসিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। এই ঐতিহ্যের প্রেরণায় আমরা ভাষাযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছি। ১৯৩৬ সালে যেসব কবি-শিল্পী স্পেনের রিপাবলিককে রক্ষা করার জন্য মাদ্রিদে প্রাণ দিয়েছেন তারাও আমার প্রেরণার স্থল।

যে দেশটির প্রতি তাকিয়ে সারাজীবন সমাজতন্ত্রকে হৃদয়ে ধারণ করেছি, তার সর্বনাশা বিলুপ্তি আমাকে কাতর করলেও তা ইতিহাসের সৃষ্টি হিসেবে মেনে নিয়েছি। কিন্তু সেই আদর্শকে এখনো মনের মন্দির থেকে বিসর্জন দেইনি।

কবির অবলম্বন– অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ। বিশ্ববস্তু, বিশ্বরস এবং বিশ্বচিন্তা সব ধরনের কবিতার উৎস। কবি কবিতায় সুন্দর, মঙ্গল এবং সত্যকে প্রকাশ করে। সেই সত্য যদি সবার কাছে সত্য হয়ে ওঠে তখনই কবিতা সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু কবিতার এই সত্য সবাই একইভাবে গ্রহণ করতে পারে না। নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি এবং সৌন্দর্যবোধ দিয়ে পাঠকরা কবিতার রস আস্বাদন করে। আমি জানি না, কাব্য-সাধনায় আমি কতটা সফল হয়েছি, কতখানি পাঠকের হৃদয় জয় করতে পেরেছি।

স্বদেশকে খোঁজা কবির একটি প্রধান কাজ। দীর্ঘদিন ধরে সত্যকে খুঁজতে গিয়ে, সুন্দরকে খুঁজতে গিয়ে, শুভকে খুঁজতে গিয়ে, মঙ্গলকে খুঁজতে গিয়ে আমি স্বদেশকে খুঁজছি। নিজের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য অবিরত চেষ্টা করছি। আইনস্টাইনের সহযোগী জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন বোস এক সময় বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন। বিদায় বেলায় বলেছিলেন, আমি উপাচার্য থাকাকালে হাতে লণ্ঠন নিয়ে শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে বহু খুঁজেছি, তাঁকে খুঁজে পাইনি। আমিও লণ্ঠন হাতে স্বদেশকে নিরন্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি– এর সামগ্রিক রাজনীতির মধ্যে, এর সংস্কৃতির মধ্যে, এর সামাজিক বিপন্নতার মধ্যে। মাঝে মাঝে কাছে এসেও বার বার দূরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছি। এই বেদনাই আমার সাম্প্রতিক কবিতার বেদনা।

সবাইকে ধন্যবাদ।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী
পাবলিক লাইব্রেরি, ঢাকা
৭ জুলাই ২০০৭

অনন্যা সঙ্গীত একাডেমির যুগপূর্তি উপলক্ষে ভাষণ

আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং নারায়ণগঞ্জস্থ 'অনন্যা সঙ্গীত একাডেমী'র সকল শিল্পী, সংগঠক, কর্মী এবং সদস্যবৃন্দ, মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথি এবং উপস্থিত সুধী মন্ডলী ঃ

অনন্যা সঙ্গীত একাডেমির যুগপূর্তি উপলক্ষে আপনারা যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন আমি প্রথমেই তার সাফল্য কামনা করি। এই অনুষ্ঠানে আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করায় আমি আপনাদের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এখন আমার বয়স ৮১ চলছে। কিছুদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে ভুগছি। ইদানীং তাই তেমন কোথায়ও যাই না। কোনো গুরুতর বিষয়ে মনোযোগ দিতে অসুবিধা হয়। কিন্তু যে কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ। তাই আপনাদের ভালোবাসার টানে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি। দু'চারটি কথা না বললে আনুষ্ঠানিকতার ব্যাঘাত ঘটে। তাই লিখিতভাবে কিছু বলছি।

সাম্প্রতিককালে আমরা ঐতিহ্যমুখী হওয়ার চেষ্টা করছি। নিজের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। জানি না নিজের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের আর কত দূর হাঁটতে হবে? কত রক্তপ্রপাত পার হতে হবে? নিজের কাছে আমাদের ফিরে যেতেই হবে। শিকড় উপড়ে ফেলা বৃক্ষে কি ফুল ফোটে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ফুল ফোটাতে না পারলে আমাদের দেশ একদিন মরুভূমি হয়ে যাবে। তাই আমি প্রতিটি সৎ এবং মহৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে ফুল ফোটাবার আয়োজন হিসেবে চিহ্নিত করি। আর এই প্রবণতাকে আমাদের মূলধারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে বিশ্বাসী তরুণদের বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতি আনুগত্য ও সংকল্পের পুনরুচ্চারণ বলেই মনে করি। বলা চলে এই প্রবণতা রেনেসাঁস তথা নবজাগরণের পূর্বাভাষ।

র‍্যনেশাঁসের জন্ম ইতালির মাটিতে। কিন্তু সে পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে প্রাচীন গ্রিস থেকে। গ্রিসের কাছ থেকে সে নিল নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দৈহিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সম্মিলন ঘটায় আত্মার গভীরতর সৌন্দর্যবোধের। ফ্লোরেন্স হলো প্রথম যুগের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের আদিগৃহ। লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো এবং রাফায়েল এই রেনেসাঁসের ফসল। রেনেসাঁস পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালিতে বিকাশ লাভ করে ক্রমশ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রভাবে ইউরোপে পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও বিজ্ঞানের দারুণ উন্নতি সাধিত হয়। ল্যাটিন ভাষার পরিবর্তে জনসাধারণের ভাষা সাহিত্যে স্থান লাভ করে। যুক্তি, মানবতাবোধ, বিজ্ঞান- মনস্কতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ঐতিহ্য সন্ধানে ব্রতী হয়ে এই নবজাগরণ ইউরোপকে শিল্প বিপ্লবের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল।

বাংলার নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকে। এই নবজাগরণের ফলে বাঙালি সমাজ থেকে জন্ম হয়েছিল বহু মনীষীর। যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অবলম্বন করে এই নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, তা পাশ্চাত্য শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল। যে ইংরেজি শিক্ষা এ দেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয়। বলা হয়ে থাকে, কেরানি সৃষ্টি করাই ওই শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এই শিক্ষা শুধু কেরানি তৈরি করেনি। সে কালের পুরানো পাঠ্যক্রম ও পুস্তকের তালিকা থেকে বুঝা যায়, শুধু কেরানি তৈরি করার জন্য এতসব প্রয়োজন ছিল না। কেরানি ছাড়াও এই শিক্ষার ফলে তৈরি হয়েছিল উকিল-মোক্তার, ডেপুটি, মুন্সেফ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছিল সমাজ পরিবর্তন প্রয়াসী কবি-সাহিত্যিক, দেশপ্রেমিক, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক। এ জাগরণ সর্বব্যাপী না হলেও এর নায়করা ঐতিহ্য সন্ধানের মাধ্যমে স্বদেশকে আবিষ্কার করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণকে শুধু ঐতিহ্য আশ্রয়ী হলে চলে না। জাগতিক ক্ষেত্রে মানুষের আত্মবিশ্বাসকেও সুদৃঢ় করতে হয়। শ্রম ও বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়। ধর্মনিরপেক্ষতাকে আশ্রয় করে একই ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ের সমস্যা ও সঙ্কটের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের লক্ষ্যও সুনির্দিষ্ট করতে হয়। নবজাগরণের প্রধান লক্ষ্য যুক্তিধর্মিতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা। উদার মানবিক মূল্যবোধ ও মুক্তবুদ্ধির প্রসার। কিন্তু কলকাতাকেন্দ্রিক এই নবজাগরণ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সকল সম্প্রদায়কে স্পর্শ করে সর্বত্রগামী হয়নি। এর সঙ্গে প্রয়োগধর্মী বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বলিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তিক নীতিবোধও তেমন গড়ে ওঠেনি। উপমহাদেশের প্রধান স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মূলত ধর্মনিরপেক্ষ হলেও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সুদৃঢ় ভীত রচনায় ব্যর্থ হয়। এটা এই নবজাগরণের প্রধান দুর্বলতা। জাতীয় জীবনে এই ট্র্যাজেডির জন্য বাঙালি মুসলমানদের গৃহ প্রত্যাবর্তন দীর্ঘায়িত হয়। তাই সুদীর্ঘ দিন অপেক্ষার পর সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে ১৯৫২ সালে ভূমিষ্ঠ হয় ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে দেশভিত্তিক হতে তার সময় লাগে আরো উনিশ বছর। দেরিতে হলেও এই অর্জন বিশ্বের একটি বিস্ময়কর ঘটনা।

রাষ্ট্র আমাদের নতুন, কিন্তু দেশ আমাদের নতুন নয়। এই দেশবাসীর একটি সুপ্রাচীন ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা আছে। এর মূল সুর মানবতাবোধ। মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান কবি আলাওল আমাদের সাহিত্যে মানবিক ধারার প্রবর্তক রূপে অমর হয়ে আছেন। দেবতা নয়, মানুষই তার কাব্যে উপজীব্য হয় প্রথম। মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডিদাস ঘোষণা

করেছিলেন 'শোন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' আমাদের চট্টগ্রামের কবি আবদুল হাকিমের সেই বিখ্যাত উক্তিও এই প্রসঙ্গে উলেৰ্খযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ

যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।
দেশীভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুড়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়॥
মাতাপিতামহক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ হিত অতি।

তাঁর রচিত উক্ত কবিতাটি নানা দিক থেকে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত তিনি বাংলা ভাষা বিদ্বেষীদের বেজন্মা বলে আখ্যায়িত করেছেন। দ্বিতীয়ত ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে ভৌগোলিক চেতনার সম্মিলন ঘটিয়েছেন। নিম্নে চট্টগ্রামের সমসাময়িক কালের আরেকজন কবির দু'টি লাইন তুলে ধরছি।

নানা বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ
জগত ভ্রমিয়া দেখি একই মায়ের পুত॥

এ লাইন দু'টি এজন্য তাৎপর্যপূর্ণ যে, এখানে বিশ্বমানবের ঐক্যের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। কবির এই উক্তি গ্রিক দার্শনিক প্রোটাগোরাসের বিখ্যাত উক্তি গধহ রং ঃযব সবধংৎব ড়ভ ধষষ ঃযরহমং –এর চেয়েও অধিক মানবিক ও অর্থবহ। এই মানবিক মূল্যবোধের উত্তরাধিকারী হিসেবে আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি। কিন্তু অতীতের অহঙ্কার নিয়ে বসে থাকলে চলে না। ঐতিহ্যকে স্বীকারের পর তার প্রবাহকে নতুন সৃষ্টি ও কর্মের মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হয়।

বর্তমানে আমরা নানা সংকটের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। আমাদের পবিত্র সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের মতো দু'টি মৌলিক স্তম্ভ মুছে দিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উচ্ছেদ করে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভ্রান্ত ধারণাকে বিগত সরকারগুলো সামনে নিয়ে এসেছিল। মীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে অবান্তর বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। সাম্প্রদায়িকতার মতো একটি অশুভ শক্তি তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আবার প্রসার লাভ করে।

বিগত জোট সরকার দলীয়করণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের সমস্ত সাংবিধানিক স্তম্ভগুলোকে অকেজো করে দিয়েছিল। নির্বাচন কমিশনকে কুক্ষিগত করে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নির্বাচনের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। লুটতরাজ এবং দুর্নীতির মধ্যদিয়ে দেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে এক ধরনের নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছিল। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করে এবং গণতন্ত্রের অকেজো খুঁটিগুলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার মধ্যদিয়ে একটি সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নির্বাচন সুনিশ্চিত করার কাজে লিপ্ত আছেন এবং বহু ক্ষেত্রে সাফল্যও অর্জন করেছেন। আশা করব, তাদের এই কর্মতৎপরতার মধ্যদিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মর্যাদার সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। সব পেয়েছির দেশ না হলেও একটি দুর্নীতিমুক্ত এবং গণতান্ত্রিক দেশ প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। বলা দরকার, রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে গণতন্ত্রকে বেশিদিন দূরে রাখলে রাষ্ট্রযন্ত্র গণতন্ত্রকে গ্রহণ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। কাজেই যত তাড়াতাড়ি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

আমাদের সবচেয়ে বড় সংকট মূল্যবোধের সংকট। আকাশ সংস্কৃতি এবং কালো টাকার মালিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের সমাজদেহে অপসংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে। যার ফলে আমাদের মূল্যবোধ নানা সংকটে জর্জরিত। আমাদের রুচি এবং মূল্যবোধ ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের সংস্কৃতিতে আমাদের পূর্ব পুরুষদের সৃষ্টিশীল অবদান এবং মহত্ত্বকে হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছি। এই অশুভ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য আমি আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

নবপ্রজন্মের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, উনবিংশ শতকী রেনেসাঁসের দুর্বলতা কাটিয়ে তারা যেন ধর্মনিরপেক্ষতা, ইতিহাস-চেতনা, যুক্তি-নির্ভরতা এবং বিজ্ঞান মনস্কতার আদর্শে পুষ্ট হয়ে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য নিজেদের তৈরি করেন। মনে রাখা প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইতিহাস-চেতনারই অংশ। ইতিহাস-চেতনা থেকে বিযুক্ত হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। মাটি থেকে রস আহরণ করতে না পারলে একে সজীব এবং জীবন্ত করে রাখা যাবে না।

আপনাদের সংস্থা মূলত একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা। কাজেই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করা আপনাদের সামাজিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সাহসের সঙ্গে পালন করবেন, আমি এই আশা পোষণ করে আমার বক্তব্যের ইতি টানছি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী
নারায়ণগঞ্জ
৮ সেপ্টেম্বর ২০০৭

ক্রান্তির নতুন নির্বাহী কমিটিকে শুভেচ্ছা

কালো প্রান্তর থেকে মর্ত্যের মৃত্তিকায় ফিরে এলাম দৈবাৎ। মর্ত্যের মৃত্তিকা মানে জীবন। মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তার জীবন। এই বাঁচার সুযোগ বার বার আসে না। সুতরাং এমনভাবে বাঁচতে হবে যেন কাপুরুষতার ধিক্কার নিয়ে তিলে তিলে অনুশোচনায় মরতে না হয়। এমনভাবে বাঁচতে হবে যেন বছরের পর বছর উদ্দেশ্যবিহীন বিভ্রান্তিতে দগ্ধ হয়ে না মরতে হয়। বাঁচতে হবে এমনভাবে যাতে সে বলতে পারে, আমার জীবনের সর্বশক্তি নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছি পৃথিবীর মহত্তর আদর্শের পেছনে। সে আদর্শ আর কিছুই নয়, মানব জাতির মুক্তি। জীবনের যে ক'টা দিন বেঁচে আছি মানুষের মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বেঁচে থাকতে চাই।
ক্রান্তির নতুন নির্বাহী কমিটিকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। যে ক্রান্তির সঙ্গে আমার রয়েছে দীর্ঘকালের আত্মার সম্পর্ক।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী
ঢাকা
২১ অক্টোবর ২০০৭

ওস্তাদ আজিজুল ইসলামের বাঁশি সন্ধ্যায় শুভেচ্ছা

আমি রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ জানি না। কিন্তু বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনে ছোটবেলা থেকে যোগ দেয়ার ফলে সঙ্গীতকে উপলব্ধি করার জন্য আমার একটি কান তৈরি হয়েছে। সেই কান দিয়ে আমি সঙ্গীতকে হৃদয়ের মধ্যে আনন্দময় করে তুলি। জীবনে আমি ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী, পণ্ডিত ভীমসেন যোশী, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ, পণ্ডিত পান্নালাল ঘোষ প্রমুখ শিল্পীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছি। বন্ধু হিসেবে বিখ্যাত বংশীবাদক প্রয়াত সুচরিত চৌধুরীকে না পেলে এই সুযোগ বোধহয় আমি পেতাম না। আমি রাগসঙ্গীতের একজন অনুরাগী। বাংলাদেশে ক্রমে ক্রমে রাগসঙ্গীত রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে লোপ পেতে চলেছে। এর অর্থ হচ্ছে ক্রমে আমরা সংস্কৃতি-বিমুখ জাতিতে পরিণত হচ্ছি।
এই দুর্দিনে এমন একজন প্রতিভাবান শিল্পী কোনো প্রকার সামাজিক স্বীকৃতি কিংবা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার তোয়াক্কা না করে নিরলসভাবে নিজেকে রাগসঙ্গীতে নিয়োজিত রেখেছেন। এই প্রতিভাবান শিল্পীর নাম ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম। আমি দীর্ঘদিন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে দূরে ছিলাম। আজিজুল ইসলামই আমার মধ্যে আবার সঙ্গীতপ্রেম সঞ্চার করেছে। নতুনভাবে কানকে তৈরি করার জন্যে আমাকে বহু সিডি উপহার দিয়ে সাহায্য-সহায়তা করেছে। তার বাঁশি শুধু আমাকে উতলা করেনি, এই বুড়ো বয়সে আমার মধ্যে এমন একটি প্রেরণার সৃষ্টি করেছে যাতে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে কবি না হয়ে সঙ্গীত শিল্পী হতে পারলেই বোধহয় জীবনের প্রাপ্তি আরো বিস্তৃত হতো। জীবনকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারতাম। স্রষ্টার তপস্যায় মগ্ন হয়ে অনন্তের কানে নিজের উপাসনা পৌঁছে দিতে পারতাম।
শুদ্ধ রাগসঙ্গীত এবং পরিশীলিত সঙ্গীতের অভাবে দেশে অপসংস্কৃতির প্রভাব দিন দিন বেড়ে চলেছে। এই দুর্দিনে এবং দুর্যোগে ওস্তাদ আজিজুল ইসলামই আমাদের আলোর পরশমণি।
মনে আছে, পাকিস্তান যুগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য ঢাকায় এসেছিলেন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী। অনুষ্ঠান হয়েছিল গুলিস্তান সিনেমা হলে। নিমন্ত্রিত শ্রোতাদের সঙ্গীত অনুরাগ এত নিম্নস্তরের ছিল যে তারা হাততালি দিয়ে ওস্তাদজীর গান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেই স্তর পার হয়ে উন্নত পরিবেশে ফিরে আসতে আমাদের দীর্ঘ সময় লেগেছিল। বর্তমানে পরিবেশের দিক থেকে আমরা তেমনি একটি নিম্নস্তরের পরিস্থিতিতে বাস করছি। অপসংস্কৃতির দৌরাত্মে মানুষের পক্ষে সঙ্গীতের সাধারণ অনুরাগী থেকে পরিশীলিত ধ্বনি-সাধক হয়ে ওঠা কঠিন হয়ে পড়েছে। জানি না, এই দুঃসময় আমরা কখন কাটিয়ে উঠতে পারব। কিন্তু আমি আশা করি, এই দুর্দিন কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম হবেন আমাদের একটি উজ্জ্বল বাতিঘর।
উলেৱখ্য, ঋত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি যখন কলকাতার পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে দর্শকরা স্টেজের দিকে জুতা ছুঁড়েছিল। দূরে একটি রেস্তোরাঁয় বসে সেদিন ঋত্বিক বলেছিলেন, আমার ছবি বুঝতে দর্শকদের আরো বিশ বছর সময় লাগবে। পরবর্তীকালে তাই ঘটেছিল। কলকাতায় যখন তার "মেঘে ঢাকা তারা" মুক্তি লাভ করে তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে দর্শকদের টিকিট কিনতে হয়েছিল।

কিন্তু ওস্তাদ আজিজুল ইসলামের বেলায় এত সময় লাগবে বলে আমার মনে হয় না। তিনি ইতোমধ্যেই কিংবদন্তিতুল্য বংশীবাদক হিসেবে শ্রোতাদের কাছে নন্দিত হয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা তার সুরেলা কণ্ঠে এমন মধু ঢেলে দিয়েছেন, যার ফলে একটি রাগ থেকে আরেকটি রাগের সূক্ষ্ম পরিবর্তনটুকুও খুব সহজেই তিনি অনুধাবন ও আয়ত্ত করতে পারেন। এভাবে তিনি তৈরি করেছেন বেশ কিছু রাগ-রাগিনী।

তার খ্যাতি দেশের সীমান্ত ছাড়িয়ে এখন বিশ্বমুখী। ভারতের কলকাতাতে তার একক বাঁশিবাদন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সঙ্গীত রিসার্চ একাডেমি ও সপ্তসুর। সল্টলেক মিউজিক ফেস্টিভালেও তার বাঁশিবাদন বিপুলভাবে প্রসংশিত হয়। ডোভার লেনের বিখ্যাত সঙ্গীত সম্মেলনে তিনিই প্রথম বাংলাদেশী শিল্পী, যিনি অনন্য সম্মানে ভূষিত হন। দিলৰ্ীর হ্যাবিটেট সেন্টারে এবং মুম্বাইতে নেহরু সেন্টারে তিনি তার সঙ্গীত প্রতিভার সার্থক পরিচয় দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়াতে পোর্ট ফেয়ারি স্প্রিং মিউজিক ফেস্টিভালে যোগদান করেন এবং অস্ট্রেলিয়ান দর্শক-শ্রোতাদের বাঁশিতে ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত শুনিয়ে অভিভূত করেন। মাত্র ৬২ বছর বয়সে তিনি দেশে-বিদেশে একজন প্রবাদপ্রতিম শিল্পীতে পরিণত হয়েছেন। আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন প্রেরণার উৎস।

তার শিল্পী জীবন আমাদের দেশের জন্য নির্মাণ করুক এমন একটি পরিবেশ যখন তার নামে পথ কেটে আমরা পৌঁছতে পারব আমাদের সংস্কৃতির মূলধারায়।

বড় ইচ্ছা ছিল আজকের অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত থেকে আমার মনের কথা, ভাবের কথা, সঙ্গীতপ্রেমের কথা আর ওস্তাদ আজিজুল ইসলামের কীর্তির কথা যথাযথভাবে আপনাদের শোনাব। কিন্তু গত মাসের ৭ তারিখ আমি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আশ্রয় নিই। ৯ অক্টোবর আমার শরীরে সফল অস্ত্রোপচার হয়। আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছি। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এক মাস ঘরের বাইরে যেতে পারব না। তাই আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য সকলের কাছে মার্জনা প্রার্থনা করছি।

সবশেষে আমি রোটারি ক্লাব অব ঢাকা, ডাউন টাউনের কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি এ রকম একটি চমৎকার অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। স্নেহভাজন ওস্তাদ আজিজুল ইসলামকে অশেষ শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ। আমি তার সুস্থ দীর্ঘায়ু এবং কীর্তিময় জীবন কামনা করছি।

ধন্যবাদ।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী
জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা
৯ নভেম্বর ২০০৭

‘নিবেদন’র ১৬ তম বার্ষিকীতে শুভেচ্ছা

যেমন নাম তেমনি কাম। ‘নিবেদন’।

চারিদিকে আজ ভীষণ অন্ধকার। গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। অসহিষ্ণু মৌলবাদের জালে জড়িয়ে সবাই ছটফট করছে। অপসংস্কৃতির অভিঘাতে শুদ্ধাচারের শুভ কল্যাণের যে চর্চা দেশে প্রচলিত ছিল তা প্রায় শূন্যতায় ঠেকেছে। গভীর দেশপ্রেম, শুভবোধ, সৌন্দর্যবোধ, রুচিবোধ, মানবতামুখীনতা এবং অসম্প্রদায়িক চেতনা আমাদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত। এসব মূল্যবোধ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

এই বৈরী পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড সাহসের সঙ্গে আমার অশেষ স্নেহভাজন বিশ্বজিৎ রায় প্রায় ১৬ বছর ধরে ‘নিবেদন’কে একটি উচ্চমানের সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে চালিয়ে যাচ্ছে। তাপক্লিষ্ট মরুভূমির তপ্ত হাওয়ায় সুস্থভাবে বেঁচে থাকা যেখানে দুরূহ সেখানে বিশ্বজিৎ ‘নিবেদন’কে সাজিয়েছে এমনভাবে যেমনভাবে বাসের ঘর সাজাতে হয় বাগান দিয়ে আর বাসর ঘর ফুল দিয়ে। বহু সৎ শিল্পীর আত্মনিবেদন এবং সযত্ন-লালনের ফলে দিন দিন উজ্জ্বলতর এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে নিবেদনের কর্মসূচি। গান নাচ আবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে এবং মানোন্নয়নে ‘নিবেদন’র ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয়।

মূর্খ মানুষের সংস্কৃতি ধর্ম আর শিক্ষিত মানুষের ধর্ম সংস্কৃতি। নাচ গান আবৃত্তি চর্চা ছাড়াও এই মহৎ বোধ ও বুদ্ধি সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে নিবেদন নিরলসভাবে কাজ করছে। তাদের ব্রতের গৌরবে আমি গৌরব অনুভব করি।

‘নিবেদন’র ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী
ঢাকা
১২ নভেম্বর ২০০৭

আট-ই-ফাল্গুন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংসদ কর্তৃক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা

ডিসেম্বর বিজয়ের মাস। আমাদের গর্বের মাস। কিন্তু এই বিজয় সাধারণ মানুষের নাগালের অনেক দূরে। আজ একাত্তরের ইতিহাস বিকৃতির চক্রান্তে ম্লান হয়ে গেছে। যা সত্য বলে অর্জন করেছিলাম তা মিথ্যায় পরিণত হচ্ছে। যে দ্বিজাতিতত্ত্বের কবর দেয়া হয়েছিল, তা আবার আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করতে চলেছে। ধীরে ধীরে এমন একটি বিষবৃক্ষ বেড়ে উঠেছে, যার তলায় ছায়া নেই। যার ডালপালায় ফুল ফোটে না, পাখি ডাকে না। সেখানে শুধু দৈত্যের বসবাস। আমরা বিগত ৩৬ বছরে দৈত্য-বধের সত্য অর্জন করতে পারিনি। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে স্মৃতির নদী হয়েছে, সেখানে আমরা বিজয়কে আর খুঁজে পাচ্ছি না। আজ সেই দৈত্য-বধের দাবি অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এটা একটা ন্যায়সঙ্গত দাবি। বর্তমান সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ এবং সেনাপ্রধান মইন উ আহমদ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ন্যায্যতা স্বীকার করেছেন। আশা করি, এ দাবি কার্যকর করতে তারা দ্বিধান্বিত হবেন না।

আপনারা আমাকে সম্মাননা জানাবার যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, খুবই ইচ্ছা ছিল সে অনুষ্ঠানে যোগদান করে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হই। কিন্তু আমার হার্টে পুনরায় সমস্যা দেখা দেয়ায় বর্তমানে আমি অসুস্থ। তাই আসতে পারলাম না। আশা করি আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন।

আপনাদের সংস্থার নাম রেখেছেন আট-ই-ফাল্গুন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংসদ। এই নাম আমাদের বিরাট আত্মত্যাগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আপনাদের সাধুবাদ জানাই। আপনারা ঐতিহ্য সন্ধানী হোন। সময়ের চাবুকে আমরা যা কিছু হারিয়েছি তা উদ্ধার করার জন্য আপনারা তৎপর হোন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হোন। আট-ই-ফাল্গুন এবং স্বাধীনতার চেতনায় সমৃদ্ধ হোন।

আপনারা একুশে ফেব্রুয়ারিকে ভাষাগত দিক থেকে আট-ই-ফাল্গুন করার যে উদ্যোগ নিয়েছেন, এই উদ্যোগটি খুবই মহৎ এবং সুদূরপ্রসারী। আপনাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে আমি একাত্মতা প্রকাশ করছি। এ ব্যাপারে আপনাদের সাফল্য কামনা করি।

অশেষ শুভেচ্ছাসহ–

মাহবুব উল আলম চৌধুরী
পাবলিক লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৭

সাক্ষাৎকার

একান্ত সাক্ষাৎকারে ভাষাসৈনিক মাহবুব উল আলম চৌধুরী

সংস্কৃতির নামে জনতাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃত্যুগুহায়

‘সাহিত্য কখনো সমাজ বিচ্ছিন্ন আকাশের কবিতা হতে পারে না’

মাহবুব উল আলম চৌধুরী। ভাষাসৈনিক। এটা তাঁর বহুমাত্রিক যোগ্যতার অন্যতম। সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতির পরিমণ্ডলে তিনি মানবতার পৰে, শোষণের বিরৰদ্ধে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছেন সেই ১৯৪২ সাল থেকে। সুদৃঢ় সাংগঠনিক যোগ্যতাসহ আমরা তাকে একজন জীবন-শিল্পী হিসেবে পাই।

জীবনের ঝরাপাতা কুড়িয়ে চেতনার দাবানল সৃষ্টিতে তিনি যথাসাধ্য ভূমিকা পালন করেছেন। চলিৰশ-পঞ্চাশ দশকে তিনি কবিতার ৰেত্রেও নতুন মাত্রা যোগ করেছেন, তাঁর কবিতা সামগ্রিক জীবন ঘেঁষা ও শৈল্পিক আঁচড়ে সমৃদ্ধ। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা মাসিক ‘সীমান্তে’র (১৯৪৭-১৯৫২) সম্পাদক হিসেবেও তিনি খ্যাত। রাজনীতির বিপৰবী ধারায় তাঁর প্রত্যয় ও প্রচেষ্টা আবেদনশীল। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনি অনেক কবিতা, নাটক, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ লিখেছেন। একুশের প্রথম কবিতা ‘কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি’ লিখে তিনি আমাদের কবিতার ভুবনে এবং রাজনীতির ৰেত্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তা ছিল ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশিত প্রথম মর্যাদাবান প্রতিবাদী মাসিক পত্রিকা ‘সীমান্তে’র পরিণতি। দীর্ঘ সময়ব্যাপী তিনি সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং রাজনীতিকে একই মেলবন্ধনে মিলিয়েছিলেন– তার সব্যসাচী ব্যাপক কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে এসব কাজের জন্য তিনি হয়ে উঠেছিলেন পূর্ব বাংলার কিংবদন্তি পুরৰষ। মাহবুব উল আলম চৌধুরীর জন্ম ১৯২৭ সালের ৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার গহিরা গ্রামের শান্তির দ্বীপস্থ সুপ্রাচীন ঐতিহ্যর অধিকারী গহিরা আসাদ চৌধুরী বাড়ির বনেদী পরিবারে। স্বদেশ, সমকাল, সমবিশ্ব, কবিতা, রাজনীতি, সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর উত্তরার বাড়িতে ‘বঙ্গজ’ এর পক্ষে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন মুহাম্মদ মহসীন চৌধুরী।

বঙ্গজ ঃ আপনার ছাত্রজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ঃ আমি ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রাম কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তখন আমি ষোল টাকা বৃত্তিও পেতাম। তখনকার পূর্ব বাংলার গভর্নর কলেজ পরিদর্শনে এসে ছাত্রদের উদ্দেশে কলেজ মিলনায়তনে ভাষণ দেয়ার সময় বাংলা ভাষা সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলে আমি তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ করি। এর ফল যা হওয়ার তাই হলো। কলেজ ছাড়তে হলো। তৎকালীন প্রিন্সিপাল আবু হেনা সাহেব ক্ষমা চাওয়ার পরামর্শ দিলেও আমি কান দেইনি। আমার সেই প্রতিবাদী চেতনা আমাকে চালিত করেছে।

বঙ্গজ ঃ আমাদের মনে হয় মুখ্যত ভাষার প্রশ্নে আপনার মানসিক আলোড়ন বহুমুখিনতায় পর্যবসিত হয়েছে।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ঃ ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার পশ্চাদ্‌ভূমিতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ছিল। ছিল দেশী-বিদেশী শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি। তবে সেই প্রবল স্রোতের উৎস হিসেবে আমি সাহিত্য চর্চা ও সংস্কৃতি সেবার মাধ্যমকে যুঁৎসই মনে করেছি।

বঙ্গজ ঃ এ ধরনের প্রয়াসকে কি আপনি আন্দোলন হিসেবে দেখেছেন ?

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ঃ আন্দোলন বৈকি। ১৯৪৫ সালে ১৭/১৮ বছর বয়সে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের চট্টগ্রাম জেলা শাখার নির্বাচিত সহকারী সম্পাদক ছিলাম। বিশ্ব শান্তির পক্ষে তথা আণবিক আগ্রাসনের বিরবদ্ধে ১৯৫০ সালে বিশ্ব শান্তি পরিষদের আহ্বানে চট্টগ্রামেও বিশ্ব শান্তি পরিষদের শাখা স্থাপন করে প্রায় সাত লাখ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে স্টকহোমে যথাসময়ে প্রেরণ করি। বিশ্ব শান্তির স্বপৰে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদানের নিমন্ত্রণ পাই এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে সে সম্মেলনে অংশহগ্রহণ করি। বিশ্ব শান্তি পরিষদের সম্মেলনে যোগ দিতে কেন্দ্রীয় কমিটি স্টকহোম থেকে আমাকে নিমন্ত্রণ পাঠায়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার আমার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করায় আমি সে সম্মেলনে যোগ দিতে পারিনি। পাকিস্তান সরকার ১৯ বছর আমাকে পাসপোর্ট দেয়নি।

বঙ্গজ ঃ সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ঃ ১৯৫৪ সালে ঢাকা কার্জন হলে সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ে আমি যে প্রবন্ধ পড়েছিলাম তাতে আমার বক্তব্য স্পষ্ট। সাহিত্য কখনো সমাজবিচ্ছিন্ন আকাশের কবিতা হতে পারে না। সাহিত্য হচ্ছে জীবনের প্রতিফলন। তাইতো সাহিত্যের আবেদন শাশ্বত। শিল্প শিল্পের জন্য (অজঞ ঋঙজ অজঞঝ ঝঅকউ) এই মতাবাদে বিশ্বাস করি না, সাহিত্য মানুষের জন্য বিশেষ করে নিপীড়িত মানুষের জন্য। এ বিশ্বাসে অটল থেকে আমি সারা জীবন সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা করেছি। যা গজদন্ত মিনারে বসে করা যায় না।

বঙ্গজ ঃ তাতে আমাদের চিন্তা চেতনাকে প্রগতিশীল করার বিষয়টিই মুখ্য?

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ঃ ঠিক বলেছ। ১৯৪৬ সালে আমি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলাম। নাম ছিল "বিপৰ্ব"। বইটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৫৬ সালে "মিশরের মুক্তিযুদ্ধ" শীর্ষক পুস্তিকা রচনা করি এবং ওই সময় সুয়েজ খাল জাতীয়করণের সপৰে বিরাট মিছিল বের করি। আমাদেরকে সুন্দর আগামীর জন্যে লড়তে হবে। ১৯৫২ সালে "কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি" কবিতা-পুস্তিকা মুসলিম লীগ সরকার বাজেয়াপ্ত করে।

বঙ্গজ ঃ আপনার সম্পাদিত 'সীমান্ত' পত্রিকা সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ঃ প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহকরূপে সীমান্ত (১৯৪৭-৫২) প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকায় দুইবাংলার নবীন এবং প্রবীণ লেখকরা লিখতেন। এতে প্রগতিশীল সাহিত্য সেবীবৃন্দ 'একটি মেলবন্ধনে' আসার পরিসর সৃষ্টি হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানদের সম্প্রীতি স্থাপন এবং অন্ধকারের বিরবদ্ধে লড়াই করা। আমাদের চিন্তাধারায় অবশ্য বৈপৰ্বিক উপকরণ ছিল। তখন মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা ছিল শীর্ষে। মুখোমুখি লড়াই করা সম্ভব নয় ভেবে 'সীমান্তে'র মাধ্যমে সমস্ত পশ্চাদ্‌পদতার বিরবদ্ধে সংগ্রাম করেছি। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে '৫১'র সংস্কৃতি সম্মেলন, '৫২'র ভাষা আন্দোলন, '৫৪'র যুক্তফ্রন্টের বিজয়, '৬৯-র গণঅভ্যুত্থান এবং '৭১-'এ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হই।

বঙ্গজ ঃ 'সীমান্ত' পত্রিকাকে বৈপৰ্বিক চিন্তাধারার প্রতীক বলা যাবে কি?

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ঃ অন্তত আমাদের দেশের বৈপৰ্বিক চিন্তাধারার প্রেৰাপটে পাকিস্তানের স্বাধীনতার পরে আমরা আসল ফাঁক ধরতে পেরে নতুন দিক নিদের্শনার সন্ধান করেছিলাম 'সীমান্ত' মাসিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে।

বঙ্গজ ঃ আপনার সম্পাদিত সেকালের পত্রিকাটিকে বর্তমানে কী চোখে দেখবেন।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ঃ আমাদের বৃহত্তর স্বার্থের পরিসরে উভয় সম্প্রদায়ের লেখকদের জাতীয় ঐতিহ্যের পূর্ণতায় একই পশ্চাদ্‌ভূমিতে আনার প্রয়োজন আছে।

তাছাড়া সেকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখপত্ররূপে সোচ্চার 'বসুমতি', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রিকাগুলো উভয় সম্প্রদায়ের লেখকদের বাঙালি জাতির ঐতিহ্য ভিত্তিক প্রধান সম্প্রদায় এর ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও উৎসবের মূল সুর নির্ণয়ে নিয়ে আসতে সৰম হয়নি। সেই কাজটি আমরা করার প্রয়াসী ছিলাম। নিঃসঙ্কোচে সুমহান মানবিক ধারায় নিজেদের প্রয়াস উপস্থাপিত করতে পেরে আমি ব্যক্তিগতভাবে তৃপ্ত।

বঙ্গজ ঃ শুনেছি সে সময় কবি সুকান্তও চট্টগ্রামে এসেছিলেন।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ঃ ১৯৪৫ সালে চট্টগ্রামে আমরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন করি। সেই সম্মেলনে কলকাতা থেকে ভবানী সেন, বঙ্কিম মুখার্জী, সোমনাথ চ্যাটার্জী, ছাত্রনেতা অন্নদাংশকর ভট্টাচার্য এবং ঢাকা থেকে মুনীর চৌধুরী ও আখলাকুর

রহমান এসেছিলেন। ওই সম্মেলনে কলকাতা থেকে কবি সুকান্ত এসেছিলেন। তার সংগে একই মঞ্চে আমি কবিতা পাঠ করি। পরবর্তীকালে 'সীমান্তে' জীবন চত্রধবর্তী তার ওপর বড় প্রবন্ধ লেখেন। আমার মনে হয় উভয় বাংলায় সুকান্তের উপর এটিই বড় প্রবন্ধ। হ্যাঁ। তবে একটি বিশেষ দিক হচ্ছে কবি সুকান্তের চিন্তাশৈলী ও কাব্যকুশলতার মূল্যায়ন এর অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে।

বঙ্গজ ঃ দেশের ৰেত্রে অবৰয় রোধে আপনার মতামত জানতে চাই।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ঃ তারধণ্য শক্তি একটি দেশের পরম সম্পদ। আমরা যেমন ১৯৫০ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলাম। মাসিক 'সীমান্ত'-এর দাঙ্গাবিরোধী সংখ্যাও প্রকশিত হয়েছিল। অর্থাৎ আমাদেরকে দেশ ও জাতির প্রকৃত উন্নয়নের প্রকৃষ্ট পথ ও উপায় খুঁজে নিতে হবে। আমরা নিতে সৰম হয়েছিলাম অকৃত্রিমভাবে। আমরা সমাজ-বিপৰ্ৰবকে এড়িয়ে যেতে পারি না। বিকৃত বুদ্ধি মনুষ্যত্বহীন মানুষ জাতির ৰতিই করে। এখানে অন্য কোনো সরল অংক নেই।

বঙ্গজ ঃ সংস্কৃতি সম্পর্কে আপনার ধ্যান-ধারণা আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে, এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ঃ ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে সংস্কৃতির নামে বিভ্রান্তিকর পথে বৃহত্তর জনতাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অজ্ঞতার আঁধারে, মৃত্যুর অতল গহ্বরে। কালের যাত্রাধ্বনিকে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করতে শিল্পী-সাহিত্যিকরা কোনোদিনই পিছ-পা হয়নি। এখানে আমি প্রগতিশীল বিপৰ্ৰবী মানসিকতাসম্পন্ন শিল্পী-সাহিত্যিকদের কথা বলছি।

বঙ্গজ ঃ আমাদের আজকের আলাপচারিতা পৰান্তরে আমাদের মানসিক প্রশিৰণের সহায়ক। আপনার মধ্যে বাঙালির জীবনে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ তার সমস্ত ঐশ্বর্য আপনি ধারণ করে আছেন। আমরা আপনার মধ্যে আবহমান বাংলার জীবন ও প্রকৃতিকে অনুভব করি। আপনার সস্নেহ সান্নিধ্যে আমার স্মৃতির সিন্দুকে আপনার কলম আরো অবিরত থাকুক। আপনার জন্মদিনে বিনম্র চিত্তে জানাই ফুলেল শুভেচ্ছা এবং নিবেদন করি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। আপনার সুস্থ জীবন ও শতায়ু কামনা করি। আপনাকে ধন্যবাদ।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ঃ আবার বলি,আমরা বিশ্বাস করি, সাহিত্য শুধু জীবনের নিছক প্রতিফলন মাত্র নয়, সাহিত্য সমাজ উন্নয়নের শক্তিশালী অবলম্বন। মানুষের কল্যাণের জন্যে যে সহিত্য, সমাজের গতিশীলতা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে যে সাহিত্য, আমাদেরকে সে সাহিত্যের প্রতি আস্থা, তথা বিশ্বাস ও অঙ্গীকারে এগিয়ে যেতে হবে। আপনাকে এবং বঙ্গজ পরিবারকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

নিজের কাছে ফিরে যেতে চাই

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সাম্প্রতিক সময়ের ভাবনা

সাম্প্রতিক কী ভালো লাগছে	ঃ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে আন্তরিকতার সঙ্গে এবং তারা বিদ্যমান সংকট থেকে উত্তরণের পথও খুঁজছে ....।
সর্বশেষ পঠিত গ্রন্থ	ঃ নেলসন ম্যান্ডেলার লং ওয়াক টু ফ্রিডম।
সম্প্রতি ভালো লেগেছে এমন বিষয়	ঃ স্বনন-এর আবৃত্তি উৎসব উদ্বোধন করতে রাজশাহী গিয়েছিলাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও সেখানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের অবাধ মেলামেশা ও বন্ধুত্ব ভালো লেগেছে।
কোন ধরনের গান শুনেছেন	ঃ শাস্ত্রীয় সংগীত মূলত, তবে প্রতিদিন ঘন্টা দুয়েক রবীন্দ্রসংগীত না শুনলে অতৃপ্তি থেকে যায়।
স্মরণীয় ঘটনা	ঃ আণবিক বোমা নিষিদ্ধকরণ দাবির আবেদনপত্র/ফর্মে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর স্বাক্ষর নিতে এসেছিলেন মানবতার কবি পাবলো নেরুদা। দিল্লিতে তাঁর সঙ্গে আমি সাৰাৎ করি। তিনি আমাকে তাঁর রচিত গ্রন্থ রেসিডেন্স অন আর্থ স্বাৰর করে উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন।
কোন কবির কবিতা বেশি মনে ধরেছে	ঃ অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, নজরুল, পাবলো নেরুদা ও বোদলেয়ার।
প্রিয় গানের কলি	ঃ মনে রেখো, যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায়, নব প্রেমজালে তবু মনে রেখো.....।
প্রিয় শিল্পী	ঃ সুচিত্রা সেন, অড্রে হেপবার্ন, কবরী সারোয়ার।
স্বপ্ন কী	ঃ নিজের কাছে ফিরে যাওয়া
প্রিয় সিনেমা	ঃ দেবদাস, অপুর সংসার, রোমান হলিডে।
প্রিয় খাবার	ঃ শিমের বিচি দিয়ে শুঁটকি রান্না।
প্রিয় কবিতা	ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মে ডে, রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার কবিতা।
প্রিয় উদ্ধৃতি	ঃ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ দিদার হাসান

দৈনিক ডেসটিনি, ১৯ জুলাই ২০০৭

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই

(জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারে মাহবুব উল আলম চৌধুরী)

‘যেদিন যুদ্ধাপরাধী শকুনদের বিচার নিশ্চিত করতে পারবো সেদিন এ দেশের মাটি পাপমুক্ত হবে’

প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ভাষাসৈনিক কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী আমৃত্যু দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। কথা বলেছেন প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে। লেখালেখি, সভা-সমাবেশ-সেমিনারে সব সময়ই ছিলেন স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সোচ্চার। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি ছিল তাঁর কণ্ঠে। সর্বশেষ সাক্ষাৎকারে দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন এ দেশের মাটিতেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে, তাদের বিচার করতেই হবে। মৃত্যুর ৫ দিন আগে ১৮ ডিসেম্বর তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সেটিই ছিল কোনো খবরের কাগজ বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার।

তিনি অসুস্থ ছিলেন। তারপরও কথা বলেন প্রায় দু’ঘণ্টা। মূলত: তাঁর শিশুকালের ঈদ নিয়ে স্মৃতিচারণের কথা থাকলেও এ সময় উঠে আসে শৈশব ও কৈশোর এবং পরবর্তীতে সংগ্রামী জীবনের কথা। বলেন, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের কথা। কথা বলেন, ভাষা আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনের প্রথম কবিতা নিয়েও। তিনি বলেন, স্বাধীনতার তিন যুগ পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এ দেশ জন্মের বিরুদ্ধে যারা কাজ করেছে আমরা তাদের এখনো আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারিনি। বিচার করতে পারিনি। সেই শকুনেরা এখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দম্ভোক্তি করছে। কেউ কেউ বলছে– এ দেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নেই। কেউ বলছে, বঙ্গবন্ধু সকল যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাই নতুন করে আর বিচারের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, স্বাধীনতার পর যুদ্ধাপরাধী হিসেবে প্রায় ৩৬ হাজার লোকের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধু প্রায় ২৬ হাজার অপরাধীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। হত্যা, নারী নির্যাতনসহ গুরুতর অপরাধীরা ছিল ক্ষমার আওতার বাইরে। তাদের যে কোনো সময় বিচার হতে পারে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিধান রয়েছে। যে বিধান অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অপরাধীদের বিচার এখনো হচ্ছে। বিচার হচ্ছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অপরাধীদের। বিচার হচ্ছে বসনিয়া হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের। দেরিতে হলেও আমাদের এখানে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিয়েছিল, যারা আমাদের সূর্য সন্তানদের ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল, যারা এ দেশের নিরীহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে, তাদের বিচারের দাবি জোরালো হয়েছে। স্বাধীনতার ৩৬ বর্ষপূর্তিতে সর্বস্তরে একটাই ছিল উচ্চারণ– যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এদেশের মাটিতেই হবে। আমিও তা দেখতে চাই। তবে এজন্য উদ্যোগ নিতে হবে। কবি বলেন, যেদিন আমরা যুদ্ধাপরাধী শকুনদের বিচার করতে পারবো, তাদের অপরাধের শাস্তি নিশ্চিত করতে পারবো, সেদিন এ দেশের মাটি পাপমুক্ত হবে। আমাদের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মা শান্তি পাবে। এ দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হবে। তিনি বলেন, জাতিগত বিভেদ আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে পেছনের দিকে। স্বাধীনতার ৩৬ বছর অতিবাহিত হলেও আমরা জাতীয় কোনো ইস্যুতে একমত হতে পারিনি। যে কোনো জাতির জন্যই এটা দুর্ভাগ্যজনক ও কলঙ্কের। যতদিন বাঙালি জাতি জাতীয় ইস্যুতে একমত হতে পারবে না ততদিন আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথ থাকবে রুদ্ধ। আমাদের এ সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উঠতে হবে। আর পেছনে ফিরে তাকানোর সময় নেই। তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আসুন আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং জাতীয় ঐকমত্যের প্রশ্নে এক ছাদের নিচে দাঁড়াই। এ অবস্থানই আমাদের আগামী দিনের সঠিক পথনির্দেশ করবে।

‘কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি’ আমাকে দিয়েছে আন্তর্জাতিক পরিচিতি

৫২’র মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কবি বলেন, কবিতার প্রতি আমার আগ্রহ কৈশোরকাল থেকেই। তখন থেকেই লেখালেখি শুরু। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ঝুঁকে পড়ি কবিতার দিকে। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশ করি মাসিক ‘সীমান্ত’ পত্রিকা। যাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে একটি সাহিত্যানুরাগী চক্র গড়ে ওঠে। ১৯৫০ সালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বশান্তি পরিষদ। এর আগে থেকেই বাংলা ভাষা আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। ১৯৫২ সালে আমাকে আহ্বায়ক করে চট্টগ্রামে গঠিত হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। সে সময় আমার বয়স ২৫। রক্তে তখন তারুণ্যের জোয়ার। উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা– পাক সরকার প্রধানের এ ঘোষণার পর বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বাঙালি সমাজ। আমরাও আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করি। এই আন্দোলন সফল করার জন্য দিনরাত কাজ করতে গিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে জলবসন্তে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হই। পরেরদিন বিছানায় শুয়েই খবর পাই ঢাকায় বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিতে ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল হয়েছে। সে মিছিলে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে পুলিশ। শহীদ হয়েছেন অনেকে। আহতও শত শত। ঢাকা বিক্ষোভের নগরীতে পরিণত হয়েছে। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে চট্টগ্রামসহ পূর্ব বাংলার আনাচে-কানাচে। এ খবর একদিকে আমাকে মর্মাহত করে, অন্যদিকে শিহরণ জাগায়। ভাষার দাবিতে নিহত-আহতদের জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করি। কিন্তু আমার শারীরিক অবস্থার কারণে কোনোভাবেই তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি। যা আমাকে ভীষণভাবে পীড়িত

করে। তাৎক্ষণিকভাবে রক্তে নাচন লাগে। বেরিয়ে আসে কবিতার পঙক্তি– 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি'। দীর্ঘ এ কবিতাটি লেখার পরপরই ছাপার ব্যবস্থা করা হয়। এটি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। শাসকদের নির্দেশে প্রেস থেকে কবিতাটির মুদ্রিত কপি নিয়ে যাওয়া হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় কবিতাটি। আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। বাসার সামনে বসানো হয় পুলিশি পাহারা। একরকম নজরবন্দি অবস্থা। যাতে সুস্থ হলেই আমাকে গ্রেফতার করতে পারে। কিন্তু আমি একটু সুস্থ বোধ করলে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপনে চলে যাই। এরমধ্যে কবিতাটির কপি ঢাকায় পৌঁছে যায়। আন্দোলন সংগ্রামরত বাঙালির হাতে হাতে চলে যায় কবিতাটি। আমিও সে কবিতার সুবাদে রাতারাতি বনে যাই মহানায়ক। একটি কবিতা নিয়ে এত মাতামাতি, আলোড়ন হতে পারে এর আগে কখনো ভাবিনি। দেখিওনি। এ কবিতার সুবাদে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর কোপানলে পড়ি আমি। তবে এ কবিতা আমাকে দিয়েছে আন্তর্জাতিক পরিচিতি। যা আমার ৮১ বছরের জীবনে সবচেয়ে বড় অর্জন।

[সাক্ষাতকারটি নিয়েছেন ভোরের কাগজ দিনের শেষে'র যুগ্ম বার্তা সম্পাদক জাকারিয়া মুক্তা।]

একুশে পত্রিকা, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৫, ফেব্রুয়ারি ২১, ২০০৮